এখন ডুয়ার্স

১৭-৩১ অগাস্ট ২০১৬। ১২ টাকা

হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ ডুয়ার্সের 'রাগবি' দধিকাদো

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল উত্তরের ভূমিপুত্ররা

সংকটে ঠাকুর মদনমোহন! পরিত্রাতা কে?

এই স্বাধীনতা দিবসে মোদিজি আদৌ 'স্বাধীন' হবেন?

ডেঙ্গু ঃ শিশুরা আক্রান্ত হলে বিপদ বেশি

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

স্বাধীনতার সত্তরে - এই আমাদের উত্তরে
প্রশ্ন জাগে, প্রশ্ন জমা হয়
অনেক বাধার পথ চিরে - পৌঁছেছি কি ঠিক নীড়ে
কেটেছে কি সমস্ত সংশয়?
এই সবুজের প্রান্তরে - চা-বাগানের অন্দরে
স্বাধীনতার বার্তা কি ঠিকঠাক?
সমস্ত গেট খুললো কি? - পেল সবাই সবাই মূল্য কি?
বিজ্ঞাপনেই বাজল অনেক ঢাক!
সাত দশকের আগের বন - ভয়াল ঘন কাড়তো মন
আজকে ফাঁকা বৃক্ষরাজি কই?
বিভেদ-বিষের লোলুপ ঠোঁট - কাঁদছে বসে বক্সা ফোর্ট
দাবির জন্য এখনো হইচই!
পর্যটনের হু-হুঙ্কার - মদ গাজা ভাং আর পাচার
বাড়ছে ক্রমে, কাড়ছে রাতের ঘুম
যোগাযোগের তেমনি খেল্ -নেই এখনো লোকাল রেল
চলছে তবু উৎসবেরই ধুম!
অনেক না-এর এই দেশে - আজো আসে মেঘ ভেসে
রোদ এঁকে দেয় স্বাধীনতার রূপ
বন-বাগিচা-পাহাড়টি - উজাড় করে বাহারটি
ভালোবাসায় হয়েছি নিশ্চুপ!

ছন্দে - অমিত কুমার দে
ছবিতে - সুজন সরকার

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
প্রধান চিত্রগ্রাহক অমিতেশ চন্দ
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল- ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (অন্তর্বর্তী সংস্করণ), ১৭-৩১ অগাস্ট ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স
একটি অগাস্ট ভাবনা ৪

জন্মাষ্টমী স্পেশাল
হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ ডুয়ার্সের ‘রাগবি’ দধিকাদো ৮
সংকটে প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন পরিত্রাণে এগিয়ে আসবেন কে? ১০
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল উত্তরের ভূমিপুত্ররা ১৫

খালি চোখে
এই স্বাধীনতা দিবসে মোদিজি কি আদৌ ‘স্বাধীন’ হবেন? ২০
ডুয়ার্সের নদীনাম ২৩
টোটোপাড়ার জলছবি ২৭
প্রকাশিত হল ‘ডুয়ার্সের হাজার কবিতা’ ৩৭

প্রতিবেশীর ডুয়ার্স
যেখানে নদী মানে ভূগোল নয়, ইতিহাস

পর্যটনের ডুয়ার্স
রসিক বিল নিয়ে রসিকতা কতদিন চলবে? ৪৪

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬
প্রহেলিকার ডুয়ার্স ২২
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ৩৫
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৩৮
খেলাধুলায় ডুয়ার্স ৩৯
বইপত্রের ডুয়ার্স ৪০
শখের বাগান ৪৪
ডাক্তারের ডুয়ার্স ৪৭

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩১
তরাই উৎরাই ৩৩
লাল চন্দন নীল ছবি ৪১

শ্রীমতী ডুয়ার্স
এবারের শ্রীমতী ৪৪

ডুয়ার্সের
কফি হাউস
এখন
জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা
গ্রুপ বৈঠক/সেমিনার
টিভিতে ম্যাচ দেখা
বাংলা-ইংরাজি পত্র-পত্রিকা
এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?
বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর
মুক্তা ভবনের দোতলায়
মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি
facebook.com/
aaddaghar

প্রকৃতির কোলে উন্নয়নের পথে

রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত, নামেই গ্রাম আসলে সম্পূর্ণ চা বাগান অধ্যুষিত, অন্তহীন সবুজে মোরা এক স্বপ্নের ভূখণ্ড। যেখানে গরুবাথান পাহাড় থেকে উড়ে আসা মেঘের দল বৃষ্টি হয়ে ভিজিয়ে দেয় চায়ের বাগ। অসংখ্য পাহাড়ি ঝোড়া একদল নর্তকীর মতো ছন্দে ছন্দে মাতোয়ারা হয়ে বয়ে যায় উত্তর থেকে দক্ষিণে। আবার কখনও রাতের অন্ধকারে শ্রমিক মহল্লা থেকে ভেসে আসা মাদল আর নাগরার শব্দে এবং আদিবাসী সংগীতের মূর্ছণায় সৃষ্টি হওয়া সুরের জাল সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েত কে মোহিত করে তোলে। তখন সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা ভুলে প্রকৃতির কোলে নিজেকে সমর্পণ করে রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত।

প্রকৃতির অকৃপণ দানে সৃষ্টি হওয়া পশ্চিম ডুয়ার্সের মালবাজার শহর সংলগ্ন ১৪১৩৫.৫ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ২২ জন। ১৯৯৮ সালে যখন চা-বাগান এলাকা ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অর্ন্তভুক্ত হয় তখনই রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্ম। আর জন্মলগ্ন থেকেই এই গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্য ছিল চা-বাগানের নন-ওয়ার্কার পরিবারসমূহের জন্য যত বেশি সম্ভব শ্রমদিবস সৃষ্টি করা। সেই সঙ্গে স্থায়ী সম্পদ তৈরি করার দিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তাই একদিকে যখন হাজার হাজার শ্রমদিবস তৈরি করে আশি শতাংশ তপশিলী জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এই গ্রাম পঞ্চায়েতের গরিব পরিবারগুলোর মুখে হাসি ফোটানোর কাজ চলেছে তখন অন্যদিকে একের পর এক পাকা নালা, কালভার্ট, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, আই.সি.ডি.এস কেন্দ্র, ভাঙন প্রতিরোধে তারজালি বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের দ্বারা স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত রূপায়িত হয়েছে এক শক্তিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতে।

সেই পরিবর্তনের ধারাকে অব্যাহত রাখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে এই গ্রাম পঞ্চায়েত। আর তাই মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পের শ্রমদিবস তৈরি ও মোট অর্থ খরচের নিরিখে বর্তমানে সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলায় রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থান প্রথম।

এবছর রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অগ্রাধিকারের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'এর অর্ন্তগত 'মিশন নির্মল বাংলা' প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ। সেই লক্ষ্যে এখনও পর্যন্ত ১২০০ শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এরই সঙ্গে রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে গড়ে তুলতে MGNREGS প্রকল্পের অর্ন্তগত ব্যক্তিগত উপকারদায়ী প্রকল্প (IBS)-এর মাধ্যমে সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করবার কাজ জোর কদমে চলছে।

নাগেশ্বর পাশোয়ান
প্রধান, রাঙ্গামাটি গ্রাঃ পঃ

মারোয়ারি ওরাও
উপ-প্রধান, রাঙ্গামাটি গ্রাঃ পঃ

রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত

একটি অগাস্ট ভাবনা

বিপ্লব ও স্বাধীনতা সেই একই অগাস্ট মাসে। এমনটি হয় না কোথাও। সত্তর বছরে পা রেখে স্বাধীন ভারত, এসময় কি খানিক পেছনের দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ মিলবে? স্বাধীনতা তুমি কার? এই প্রশ্ন রাখবার সুযোগ কি মিলবে? সত্তর বছরে এই প্রান্তভূমির নিরীহ নির্বিকার মানুষগুলি কী পেয়েছে তার উত্তর কি মিলবে? নবজাতকের কাছে কোনও অঙ্গীকার রেখে যাওয়ার সুযোগ কি মিলবে?

আমরা যারা চেতনাসম্পন্ন মননশীল মানুষ বলে কিঞ্চিৎ হলেও গর্বিত, আমরা যারা রোজ একাধিক সংবাদপত্র পড়ি, সবকটি সংবাদ চ্যানেলে নজর রাখি, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে বিশেষ সচেতন থাকি ও নিয়মিত সোশাল মিডিয়াতে আপডেট থাকি, তারা সবাই কিন্তু উপরের প্রশ্নগুলির উত্তরে অবজ্ঞার মিচ্‌কি হাসি ছাড়া অন্য কিছুই দিতে পারব না, সম্ভব হলে 'কাব্যিক' বা 'কিতাবি' আখ্যা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেব।

আমাদের কাছে স্বাধীনতা মানে বছরে একদিন পতাকা উত্তোলন বা রক্তদান শিবির কিংবা কোরাস সংগীতের বাইরে একটি ছুটির দিন ছাড়া আর তেমন কিছু নয়। কারণ স্বাধীনতা সংগ্রাম বা স্বাধীনতার সময় আমাদের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয়নি। তবু কেন জানি না স্বাধীনতার গান আমাদের রক্তেও উষ্ণতা বাড়ায়, চোখের সামনে বিশাল তেরঙ্গা পত্‌পত্‌ করে উড়তে দেখলে কিংবা সচিন-কোহলির মারমুখি রূপ দেখলে আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠি। পরিষ্কার অনুভব করি ধমণীতে বইছে এমন এক সংস্কৃতির বীজ যা হাল আমলে সৃষ্ট নয়, যুগে যুগে যা রূপ নিয়েছে এক মহীরুহের।

সত্তর বছর কম সময় নয়। হয়ত আরও অনেক কিছু হওয়ার ছিল, কিন্তু যেটুকু হয়েছে তাই বা কম কিসে? তাই রাজনৈতিক নেতাদের নিন্দেমন্দ করে কাটালেই স্বাধীনতার অর্থ সফল হবে এমন কোনও মানে নেই। রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নেওয়ার যে প্রচলন শুরু হয়েছে, সময়ের বিবর্তনে তারও সদর্থক দিক একদিন বেরিয়ে আসতে বাধ্য, যে দিন রাজনীতি তথা দেশ চালানোর পাঠক্রম চালু হবে কলেজ সিলেবাসে, যেদিন ভিন্নমাত্রার পেশা হিসেবে নব্য প্রতিভারা বেছে নেবেন রাজনীতিকেই। আজ যাকে পেশা বা জীবিকা হিসেবে দেখতে ঘৃণার সঞ্চার হয় আগামীকে তার সদর্থক রূপ ধরা দেবে। আমরা সেই দিনটিরই অপেক্ষায় আছি।

'এখন ডুয়ার্স'-এর গ্রাহক সংক্রান্ত কথা

আমরা দুঃখিত, আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এবং কাগজে এর আগে ঘোষণা সত্ত্বেও 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক নেওয়া শুরু করতে পারিনি। তার প্রধান কারণ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠকের ঠিকানায় পত্রিকা পৌঁছাবার নেটওয়ার্ক আমরা এখনও তৈরি করে উঠতে পারিনি। আমরা প্রতিনিয়ত বহু ফোন এবং মেল পাই গ্রাহক হওয়ার অনুরোধ নিয়ে। সকলের কাছে আমাদের একটাই উত্তর, যেখানে যেখানে বাড়িতে/অফিসে কাগজ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানে বার্ষিক গ্রাহক হওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই—পত্রিকা এমনিতেই আপনার কাছে পৌঁছাবে। আর প্রত্যন্ত এলাকার পাঠকদের অনুরোধ করব, আপনারা নিকটবর্তী কাগজবিক্রেতার স্টলে আগাম বলে রাখলে 'এখন ডুয়ার্স' আপনার জন্য রাখা থাকবে। পাঠকের এই ভালবাসা মূলধন করেই আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রকাশক

(পত্রিকা না পেলে ফোন করুন **৯৮৩০৪১০৮০৮** নম্বরে)

সুমধুর সুন্দরবন

প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য এখানে অনাবিল। ফুলের গন্ধে ভারী হয়ে থাকা বাতাস, গা-ছমছমে ঘন অরণ্য আর নিজের খেয়ালে বয়ে চলা নিস্তরঙ্গ জলপথ - সব মিলিয়ে সুন্দরবন এখানকার চাকভাঙা মধুর মতোই মিষ্টি এবং মনোহর।

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
DEPARTMENT OF TOURISM, GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb
www.twitter.com/TourismBengal +91(033) 2243 6440, 2248 8271

Download our app Google play

খুচরো ডুয়ার্স

খুনির্মলবাবুর ছদ্মবেশ

ছদ্মবেশটা কাজে লাগল না। আসলে ভালো 'মেকআপম্যান' না হলে যেমন নাটক ঢিলে পড়ে যায়, সেরকমই খুন-টুন করলে একটু পরিপক্ক মাথার দরকার পড়ে। আরে বাপু! খুন করে চুলদাড়ি কামিয়ে ফেললেই হবে? আর বুঝি প্রোটেকশন লাগবে না! এসব পুরনো সিনেমার থিম হে! এক্কেবারে রেট্রো! মালদার এক দম্পতিকে হত্যা করে খুনি নির্মল ভেবেছিল গাল-মাথা কামিয়ে ফেললেই বোধহয় 'ছদ্মবেশ' হয়ে গেল। সেটাই করেছিল সে। কিন্তু সাধের মেকআপ কাজে এল না। কী করে আসবে? খরচা

করবি না, ধরা পড়বি না! নিয়ে আসতিস কোনও এক বলিউডের বাঘা মেকআপ আর্টিস্টকে। লাখ দশেক ফি দিয়ে এমন 'মেকআপ' নিতিস যে পুলিশ তোকেই 'খোঁচড়' হিসেবে লাগিয়ে দিত কাজে।

আত্মহারা পথ

সাতখানা রাস্তা সাত সাতখানা গ্রামের, অথচ কাণ্ড দেখো! সব ক'টাই খাস্তা। রাস্তা বেয়ে পথ চলতে গিয়ে মানুষকে কী যুদ্ধই না করতে হচ্ছে নিত্য। অবশ্যি সেই সাত রাস্তা কোনও একদিন রাস্তা ছিল। এখন অণুবীক্ষণ হয়ে দেখলে কিছু পাথর-পিচ-বালুর আভাস পাওয়া যাবে। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের সাতটি গ্রাম রাস্তা হারিয়ে প্রতিপদক্ষেপ হয়ে সরকারের মুণ্ডপাত করে হাঁটছে। তাতে অবশ্যি সরকারপক্ষের ভ্রুক্ষেপ নেই। ব্লকের নাম ফাঁসিদেওয়া বলেই বোধহয় এইরকম ফেঁসে আছে সেখানকার সড়ক। কিন্তু সড়কের এইরকম মড়ক তো আজকাল ডুয়ার্সের নিত্যকার জীবনযাত্রা। যেমন ধরুন শিলিগুড়ি যাওয়ার রাস্তা। বারোটা বাজতে শুরু হয়েছে। এমন হরেক কোটি নমুনা চাইলেই পাওয়া যাবে। না বললে বুঝতেই পারবেন না যে আপনি পাকা সড়ক দিয়ে হাঁটছেন। পথ নিজেই গিয়েছে হারিয়ে।

হাটপাতাল

জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের সামনে যে ফুটপাথ নামে একটা বস্তু ছিল তা ইদানীং চোখেই পড়ে না। কারণ সেখানে 'হাট বসছে প্রত্যেক বারে'। ভুল করে যাঁরা ফুটপাথ পথচারী হওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের শুনতে হচ্ছে দোকানদারদের গঞ্জনা, 'আরে মশাই, এটা কি হাঁটবার জায়গা?' ভাবুন তাহলে, ডুয়ার্সের কোন পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি। এর পর হয়ত কেউ বাড়িতে এসেও বলে বসতে পারে, 'এটা কি থাকার জায়গা!' খুব সাবধান। এই জন্যই তো বলি রে ভাই, 'নো ফুটপাথ, নো উৎপাত!'

টোপ লোপ

উপরের শব্দটি বাস্তবায়িত হচ্ছে কালচিনি চা-বাগানে। একটা নয়, দুটো নয়, কালচিনি ব্লকের চারটি চা-বাগানে চারটি চিতা বাঘ রীতিমতো মস্তানি করে বেড়াচ্ছে। তোলা আদায় তো রোজ রাতেই। এই মুরগিটা, ছাগলটা, গোরুটা ভ্যানিশ। শ্রমিকরা আর চা-পাতা তুলতে যেতে চায় না। কী জানি, তারাও যদি ভ্যানিশ হয়ে যায়। বন দপ্তরের পরামর্শ নিয়ে বাগানবাবুরা এবার চিতা ধরতে আদা-জল খেয়ে লেগেছেন। ফাঁদও পেতেছেন জবরদস্ত। কিন্তু পাতা ফাঁদ চিতারা বিলকুল 'বাদ' দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতিউতি। কারণ, ফাঁদের জন্য টোপ হিসেবে ছাগল তো দূরের কথা, একটা মুরগিও জোগান দেয়নি! অতএব চিতারা 'ইগনোরিং দ্য ট্র্যাপ'। ঠিক মাছদের যেমন শুকনো বড়শি ঠোকরানোর তাগিদ নেই।

কুম্ভীর বিভ্রান্তি

তিস্তা নয়, তোর্সা নয়, মায় জলঢাকা অবধি নয়। শেষমেশ করলা নদীকেই আতঙ্কের কেন্দ্রস্থল হতে হল। কেননা, কেহ বা কাহারা নাকি সেই নদীতে কুম্ভীর দর্শন করিয়াছেন, আর তাতেই ঘুম উবিয়া গিয়েছে জলপাইগুড়ি শহরবাসীর। করলায় কুম্ভীর ব্যাপারটা বেজায় 'ইমপসিব্‌ল' বলে জানিয়ে দিয়েছে বন দপ্তর। ঠারেঠোরে আরও বলেছে যে, করলায় করালকুম্ভীর দর্শনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে যেটা-সেটা সেবন এবং

পান করা দরকার। নির্ঘাত কুমির-দেখা লোকটি সেই কোর্স কমপ্লিট করে এসেছিলেন। কিন্তু এতেও অনেকে সন্তুষ্ট হচ্ছে না। ডিজিটাল যুগ রে দাদা! ইনফো পেয়ে ওদিককার কুমির যে এদিকে আসবেই না, এমন দিব্যি কে দিয়েছে বটে? একটু দূরে রায়গঞ্জে কি ঘড়িয়াল আসে না? ট্যারেন্টুলা আসে না? তবে?

পাঙ্গা নিস না

'তাই তাই তাই/ মামাবাড়ি যাই/ মামাবাড়ি ভারী মজা/ কিল চড় নাই।' আজ্ঞে, ছড়াটা কতটা সত্যি তা নির্ণয় সম্ভব নয়, তবে মামাবাড়ি এসেও যে ভেসে যাওয়া যায় তা এবারের বর্ষা দেখায় দিল গো। ডুয়ার্সের পাঙ্গা নদীর কথা মনে আছে? সে যে বর্ষার সময় কীরকম পাঙ্গা নিয়ে ফেলে তা ধারণারও একটু একটু অতীতই বটে। তো মামাবাড়ি বেড়াতে এসেও পাঙ্গা যে কেন নিতে গেল কে জানে সেই ছেলেটা! ফলে গেল হারিয়ে চিরদিনের জন্য! ভাই, যতই সাঁতার জেনে থাকিস, ভরা বর্ষায় ডুয়ার্সের নদীকে 'তুশ্চু' করিস না ভাই! পাঙ্গা নিস না!

কেসমাদৃষ্টপূর্বম্‌

এ যে সত্যি 'অভিনব কেস'! আগেকার দিনে যেমন দু'-একটা কারণে গ্রামের লোকেরা কোনও পরিবারকে 'একঘরে' করে দিত, অনেকটা সেইরকমই ব্যাপারস্যাপার শুনতে পাচ্ছি প্রতিবেশীর ডুয়ার্সে। আপনার যদি শৌচালয় না থাকে, তবে আপনি চায়ের দোকানে গেলে চা পাবেন না, চুলদাড়ি কাটাতে গেলে পরামানিক দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে! কী যন্তনা!! এটাই নির্মল অভিযানের একটা নতুন নমুনা। তো আমাদের প্রশ্নটা হল যে, শৌচাগার যে নেই তা দোকানিরা জানছে কীভাবে গো? সেধে সেধে লক্ষ্মী পিটিয়ে সরস্বতী বানাতে

চাওয়াটা কি সোজা কথা আজকের যুগে? সত্যিই ‘অদৃষ্টপূর্বম্ কেসম’।

হবে

অ-ব-শে-ষে শোনা গেল যে, বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির নাকি এবার সংস্কার হবে। তার মানেই পর্যটনের ভিড় আর পর্যটনে ভিড় হলেই বাণিজ্যে লক্ষ্মী আসবেন বাস করতে। এতদিন যে বিচ্ছিরি হয়ে থাকা উক্ত রাজবাড়ির চেহারা দেখে ‘ঐতিহ্য’র বদলে ‘ভূতুড়ে’ কথাটাই বেশি মনে হত, এবার ভূতুড়ে ভাব দূর হয়ে ফিরে আসবে আসল চেহারা! শুনে তো ভালই লাগছে। ডুয়ার্সে তো কুল্যে দু’খানাই রাজবাড়ি। একটার কথা তবু লোকের কাছে বলা যেত, এবার আরেকটার কথাও বলা যাবে। কিন্তু কবে? আশাবাদীরা উত্তরে বলছেন, ‘তিষ্ঠ! হবে।’

‘বিরোধী’ লোপ

খড়িবাড়িতে ‘মানব পাচার বিরোধী’ দিবস উদ্‌যাপিত হল। এমন শুভ খবরে ভারী খুশি আমরা। আরও দু’টি-একটি জায়গায় হয়েছে ডুয়ার্সে এই দিনের পালন। তবে কমিয়ে

বলতে গিয়ে কোথাও কোথাও বক্তারা ঘন ঘন ‘মানব পাচার দিবস’ সফল করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। আহা! এমন দিবস সফল করবে বলেই তো পাচারকারীরা নিত্যদিন লেগে রয়েছে গো! তুই আবার সভা ডেকে তাতে তাল মেলাস কেন? ‘বিরোধী’ শব্দের মানমর্যাদা রাখতে হবে তো!

ব্রহ্মা নোজ ওনলি

ঘটনাস্থল মেটেলি ব্লকের ‘মাথা চুলকা’ এলাকা। আধ ডজন যাত্রী নিয়ে বলা নেই, কওয়া নেই উলটে গেল একটা ‘পিকআপ ভ্যান’। খুব যে পিকআপ তুলেছিল, তাও নয়। মানে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে উলটে যাওয়ার জন্য যা যা লাগে তা দেখা যায়নি সেই ভ্যানে। তবুও কুপোকাত। তবে চালক কি মাথা চুলকাচ্ছিল আনমনে? জায়গাটা তো সেটাই ‘অর্ডার’ করছে হে! ওলটানোর কারণ নাকি এখনও রহস্যময়। সম্ভবত ‘ওনলি ব্রহ্মা নোজ!’ কিন্তু রঙ্গরস থাক। পিকআপ ভ্যান নামক বস্তুগুলি দুর্ঘটনা ঘটাবার ক্ষেত্রে যে প্রতিভা দেখিয়ে আসছে ডুয়ার্সে, এবার সেটা থামানো দরকার। লোকে তো শখ করে ওঠে না ওতে। চালকরা এবার যদি বোঝেন যে এ গাড়ি মেপে চালাতে হয়। যদি বোঝেন...! যদি...

তালা(ক)

শিক্ষক আসেননি বলে অনুষ্ঠান বন্ধ। না না, থুড়ি, ভুল বললাম। শুধু অনুষ্ঠানই নয়, স্কুলই বন্ধ। ধূপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়া ঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক স্কুলে এমনি বদনাম শোনা যাচ্ছে। লোকে রেগে গিয়ে বলছে, ছাত্র এসে ক্লাস ঘর ভরে যায়, আর মাস্টার এসে অফিসঘরই ভরাতে পারে না! সত্যি কথাই বটে। সে দিন নাকি কোনও মাস্টারই আসেননি। রাগে উদ্‌বাহু হয়ে অভিভাবকরা পঞ্চায়েতপ্রধানের কাছে অভিযোগ জানাতেই তিনি গটগটিয়ে স্কুলে এসে লাগিয়ে দিয়েছেন একখান শক্তপোক্ত তালা। তালা দিয়েই ‘তালাক’ দিয়েছেন মাস্টারদের। তারপর? তারপর আর কী! ‘আর হবে না’ মুচলেকার বিনিময়ে তালা ও ‘তালাক’ প্রত্যাহার।

এসি’র ধোঁকা

সরোজেন্দ্র দেব আর্ট কমপ্লেক্স-এর জটিলতার কথা বুঝি আগে বলিনি? কত্তবার বলেছি! এবার নিজেরাই টের পেলেন কর্তা-বিধাতারা। সে দিন ছিল পঞ্চানন ঠাকুরের স্মরণ উৎসব। শ্রাবণের রোদ্দুর মুখরিত ভ্যাপসা গরমে শাসকদলের বাঘা বাঘা নেতা হাজির। সবাই ভেবেছিলেন ‘এসি’ হলে বসে প্যাচপেচে গরম থেকে শরীরের পেশিকে রেহাই দেবেন। কিন্তু কমপ্লেক্সের এসি চললে যে গরম বেড়ে যায় তা কে জানত! ফলে ঘেমে-নেয়ে একসা হয়ে মিটিং ভাঙার আগেই চম্পট কয়েক ‘বাঘা’র। বাকিরা যে মূর্ছা যাননি— এটাই ঢের। শেষে একজন বাঘা নেতা যাওয়ার সময় বলে গিয়েছেন, ‘জলদি স্টেপ নিচ্ছি!’ যাক! বলেছেন যখন, তখন উলটো এসি’তেই ক’দিন আরও না হয় গরম হওয়া যাবে। তারপর শীত এলে এসি লাগবে না। তারপরে গরম এলে আবার ভুলে যাবে’খন।

টুকরাণু

ছিটমহলের ‘ভরসা ফুর্তি’, অশান্তি নাকি অসীম এখনও। বাগডোগরায় ঘন ঘন বাইক চুরি। নদী থেকে বালি-পাথর তোলা বন্ধ এবং নির্মাণকর্মীরা ফতুর। দার্জিলিঙের পাহাড়ি ধসে মচাৎ হল গাড়ির ছাদ। ডায়নার জলে ডুবন্ত নাগরাকাটা যেন দ্বীপ। মেজাজ হারিয়ে ফেললেন শিলিগুড়ির মেয়র। রক্তচাপ? মেখলিগঞ্জে দুর্ধর্ষ ডাকাতি। বন্যার পর ডুয়ার্সের মিডডে মিল বেশির ভাগ জায়গায় আলু সেদ্ধ-ভাত-এ এসে ঠেকেছে। মালদায় মিলল সেন আমলের মুদ্রা এবং সেসব নিয়ে লোকজনের পলায়ন। উদ্ধার। শ্রাবণের প্লাবনে কপাল পুড়ল জলপাইগুড়ি জেলার। কৃষিতে ‘ডাং’ তিরিশ কোটির বেশি। গ্যাস বোঝাই গাড়ি উলটে তিস্তা ব্রিজের আগে তিরিশ কিলোমিটার যানজট। ‘চলো যাই তৃণমূলে’ অভিযান ডুয়ার্সে অব্যাহত। দিনবাজার দহনের বর্ষপূর্তি এবং দহনস্থল এখনও ফাঁকা। বীরপাড়া-মাদারিহাটে মিডডে মিলের চাল চুরি করেই চলেছে হস্তীবাহিনী। মালদায় জুয়া খেলে সাত খেলুড়ের প্রাপ্তি হাজতবাস। লাটাগুড়িতে এক ডজন গুন্ডা হাতিকে চিহ্নিত করল বন বিভাগ। ওরা নাকি শাসকদলকেও পরোয়া করে না। ডুয়ার্সের বাজারে শোভা পাচ্ছে ‘দিদি-রাখি’। খুব নাকি চাহিদা!

কেস জল্পেশ

হুম বাবা! ভাবছেন তো, জল্পেশবাবার মাথায় জল ঢেলে মনের ভার থেকে মুক্ত হবেন। একটার সঙ্গে কিন্তু আরেকটা ফ্রি হয়ে যেতে পারে। মানে মনের সঙ্গে ‘পকেটভার’ লাঘব হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। জল ঢেলে বেরিয়ে এসে অনেকের চোখে দেখা যাচ্ছে অশ্রু। না না। পুণ্যাশ্রু নহে! কষ্টাশ্রু! ফাঁকা পকেট প্রত্যক্ষ হেতু নির্গত অশ্রু আর কী! সাবধান!

হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ ডুয়ার্সের ‘রাগবি’ দধিকাদো

উত্তরবঙ্গের তথা ডুয়ার্সের অতি প্রাচীন একটি গ্রামীণ খেলা ‘দধিকাদো’। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেক গ্রামীণ সংস্কৃতির মতোই হারিয়ে যেতে বসেছে এই সুপ্রাচীন খেলাটি। দধিকাদো, যার পোশাকি নাম নারকেল খেলা, সেটি সাধারণত উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। বিশেষত কোচবিহার জেলার বিভিন্ন গ্রামে জন্মাষ্টমীর সময়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরের দিন অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের এই খেলায় মেতে উঠতে দেখা যেত। গ্রামের বিভিন্ন পরিবার এককভাবে, আবার কখনও যৌথভাবে এই খেলার আয়োজন করে। নিয়মটা হল, একটা ফাঁকা জায়গায় জল ঢেলে তাকে কর্দমাক্ত করা হয়। খেলার আগের দিন তুলসীতলায় নারকেল রেখে দেওয়া হয়। পরদিন ভোরবেলা গ্রামের সব বাচ্চা একত্র হয়ে আগে নারকেলটাকে পুজো করে যেখানে খেলা হবে, সেই কর্দমাক্ত জায়গায় রাখে। কাদা মাখা, পিচ্ছিল জায়গা থেকে ওই নারকেলকে নিজের দখলে রাখার লড়াই হল এই খেলার লক্ষ্য। শুধু যে বাচ্চা ছেলেমেয়েরাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করে তা নয়, অনেক সময় বড়রাও নারকেল দখলের লড়াইতে নেমে যায়। লৌকিক ধারণা, এই কাদা খুব পবিত্র। খেলার শেষে তাই গ্রামবাসীরা নিজেদের গায়ে-মাথায় এই কাদা মেখে নেয়। এর পর প্রসাদ খাবার পালা। দধিকাদো বা নারকেল খেলায় দর্শকরা যে নিছক আনন্দ উপভোগ করত বা শারীরিক কসরত দেখতে পেত তা কিন্তু নয়। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষকেই এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত বলে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণও তৈরি হত। অথচ বিভিন্ন গ্রামে আজকাল এই খেলা আর প্রায় দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে।

হারিয়ে যেতে বসা এই গ্রামীণ লৌকিক খেলাটি নিজের ক্যামেরায় বন্দি করে আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছেন কোচবিহারের সুজন সরকার। চিনের ‘চায়না

ফোকলোর ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। চিনের এই সংস্থা ইউনেস্কো'র সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোকচিত্রকে পুরস্কৃত করে। গত বছর এই খেলাটির উপর 'নারকেল খেলা' বা 'কোকোনাট গেম' নামে একটি ফোটো ডকুমেন্টারি তৈরি করে সুজনবাবু এই সম্মান অর্জন করেন। চিনের সাংগ্রিলা শহরে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছিল। পেশায় শিক্ষক হলেও লেন্স দিয়ে সবকিছুকে দেখা সুজনবাবুর নেশা। তাই তাঁর নজর এড়ায়নি হারিয়ে যেতে বসা এই খেলাটি। বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে তিনি এই খেলাটির ছবি তুলতেন। কিন্তু বছর দুয়েক হল, আশ্চর্যজনকভাবে হাতে গোনা দু'-একটি জায়গা ছাড়া প্রচুর ঘুরেও তিনি কোথাও আর এই খেলাটি দেখতে পাননি। গ্রামীণ এই খেলাটিকে কালের গহ্বরে তলিয়ে না যেতে দিয়ে তিনি যে একে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিলেন, তার জন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য।

পেশায় শিক্ষক নেশায় ফোটোগ্রাফার সুজন সরকার

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস
ছবি: সুজন সরকার

সংকটে প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন পরিত্রাণে এগিয়ে আসবেন কে?

মদনমোহনের সঙ্গে কোচবিহারবাসীর নাড়ির টান। তাঁর সঙ্গে এখানকার মানুষের সম্পর্ক শুধুমাত্র ভক্ত-ভগবানের নয়। অনেকটা 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা'র মতো একটা খুবই কাছের মানবিক সম্পর্ক। মনের ইচ্ছা, বাসনা, ভাল লাগা, মন্দ লাগা, অভাব-অভিযোগ— সবেই তাঁর কাছে অবাধ যাতায়াত শহরবাসীর। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে সময়টা ভাল যাচ্ছে না মদনমোহনের। একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছেন তিনি প্রায় দু'বছর ধরে। এই সংকট আবার যে-সে সংকট নয়— একেবারে খাদ্যসংকট। আজ্ঞে হ্যাঁ, চমকে ওঠার মতোই ব্যাপার বটে। বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে বেশ কিছুদিন হল এক্কেবারে খবরের শিরোনামে তিনি। তবুও কোনও লাভ হচ্ছে না। পরিস্থিতি যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই। সরকারের তরফ থেকে যে টাকা আসার কথা তা তো এক প্রকার বন্ধই, আর যতটুকু পাওয়া যাচ্ছে, তাও বেশ অনিয়মিত। ফলে মন্দিরের ট্রাস্ট বোর্ডের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। দেবতাদের তো আর অভুক্ত রাখা চলে না, অতএব তাদের নিত্যপুজোর খরচ চলছে প্রণামির টাকাতেই।

মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে, মন্দিরের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার সরকার কেন বহন করবে? অন্য কোথাও তো এই ঘটনা শোনা যায় না। এর পিছনে আছে এক দীর্ঘ ইতিহাস— কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস। তখন স্বাধীন দেশের রাজ্য ছিল বর্তমান কোচবিহার জেলা। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও কোচবিহার তখনও তার মধ্যে ছিল না। কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে ভারত সরকারের কোচবিহারকে ভারতভুক্তি করার একটি চুক্তি হয়। ১৯৪৯ সালের ২৮ অগাস্ট এই 'মার্জার এগ্রিমেন্ট' হলেও কোচবিহার রাজ্য হস্তান্তরিত হয় ওই বছর ১২ সেপ্টেম্বর। এর পর ১ জানুয়ারি ১৯৫০-এ কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই 'মার্জার এগ্রিমেন্ট' অনুযায়ী কথা হয় যে, কোচবিহার রাজ্যের রাজার পরিচালিত যে ক'টি মন্দির রয়েছে, তার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করবে সরকার ('মার্জার এগ্রিমেন্ট'-এর ছবি আছে)। কারণ, কোচবিহার দেশীয় রাজ্য থাকাকালীন মন্দিরের খরচ চলত মহারাজার দেবত্র নামে রাখা কয়েকশো বিঘা জমির আয়ের থেকে। কিন্তু রাজ্য হস্তান্তর হয়ে যাবার পর প্রায় সমস্ত জমিই ভারত সরকার অধিগ্রহণ করে। চুক্তি অনুযায়ী তাই ভারত সরকার এই ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য। কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গভুক্তির আগে কয়েক বছর কেন্দ্রশাসিত ছিল। ফলে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৯ পর্যন্ত এই ব্যয়ভার ভারত সরকার দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গভুক্তির সময় ডা. বিধানচন্দ্র রায় কোচবিহারে এসেছিলেন। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল সি গোপালাচারী সে দিন একটি নোটিফিকেশনে কোচবিহারকে একটি স্বতন্ত্র জেলা বলে ঘোষণা করলেন। এর পর থেকেই এই ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব এসে পড়ে রাজ্য সরকারের উপর। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে পরবর্তীতে মহারাজকে একটি চিঠি দিয়ে এই ভার বহন

করার ভরসা দেওয়া হয়।

কোচবিহার রাজপরিবারের মন্দিরগুলো ঠিকমতো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯৫৬/৫৭ সাল নাগাদ গঠন হল দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের, যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বয়ং মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ। ঠিক হল, মহারাজার নমিনি হিসেবে তিনি তিনজনকে নিয়োগ করতে পারবেন। তবে এঁদের নিয়োগ সরকারি অনুমোদন ছাড়া হবে না। সে সময় প্রথম তিনজন নমিনি ছিলেন কোচবিহার স্টেটের শিক্ষা মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন উপমন্ত্রী সতীশচন্দ্র রায় সিংহ, ধরণীশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং দেবেন্দ্রানন্দ চক্রবর্তী। এ ছাড়া রাজ্যের তরফ থেকে দু'জন সরকারি প্রতিনিধি এই ট্রাস্টে থাকবেন, তাঁরা হলেন তৎকালীন ডেপুটি কালেক্টর বা ডিসি এবং সদর মহকুমাশাসক। অর্থাৎ দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ছ'জন। জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিরাজেন্দ্রনারায়ণ প্রেসিডেন্ট হলেও এর পর রাজার কোনও সরাসরি উত্তরসূরি না থাকায় পদাধিকারবলে রাজার অবর্তমানে পরবর্তীতে ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট হন জেলাশাসক। এই বোর্ডের অফিস শুরুর দিকে সাগরদিঘির দক্ষিণে বর্তমান সদর গভর্নমেন্ট স্কুলের পাশে থাকলেও, একটি চুরির ঘটনার পর ১৯৭৪ সালে অফিসটি মদনমোহন মন্দিরের ভিতর নিয়ে আসা হয়। প্রথম দিকে ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভিনিউ দপ্তরের অধীনে স্বয়ংশাসিত এই সংস্থাটি থাকলেও ১৯৮৮ সালে এটি পর্যটন দপ্তরের অধীনে চলে যায়। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কয়েকজন অভিযোগ করলেন, তারপর থেকে এযাবৎ এই ট্রাস্ট বোর্ড চালাতে কোনওরকম অসুবিধা হয়নি তাঁদের। কিন্তু ২০১১ সালে নতুন সরকার আসার পর প্রথম দিকে ঠিকঠাক চললেও বছর দুয়েক যাবৎ চূড়ান্ত অর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডকে।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকা মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্দির হল মদনমোহন বাড়ি। দীর্ঘদিন ধরে পর্যটন দপ্তর থেকে টাকা না আসায় শুধু মদনমোহন নয়, সমস্যায় পড়েছেন বোর্ডের কর্মীরাও। আগে এতগুলো মন্দির, আনন্দময়ী ধর্মশালা, কবিরাজ খানা— সব মিলিয়ে বোর্ডে কর্মীসংখ্যা ছিল ১৪৪ জন। বর্তমানে স্থায়ী কর্মী রয়েছেন ৫৩ জন, আংশিক স্থায়ী কর্মীসংখ্যা ৩৪, বাকিরা ক্যাজুয়াল। কোচবিহারে ১১ জন গ্রুপ ডি-র মধ্যে বর্তমানে রয়েছেন মাত্র ২ জন। বেনারসে একটি গ্রুপ ডি পদ ফাঁকা। মদনমোহন মন্দিরে ভোগ পাচকেরও একটি পদ শূন্য। অবসরগ্রহণের পর যাঁরা এক্সটেনশনে কাজ করছিলেন, বর্তমান জেলাশাসক আসার পর তাঁদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়োগও বন্ধ। ফলে কর্মীসংখ্যা কম হওয়ায় নিজেদের কাজ ছাড়াও প্রত্যেককেই বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। হেড অফিসে সব দায়িত্ব পালন করতে হিমশিম খাচ্ছেন ট্রাস্টের কর্তব্যরত কর্মীরা— এমনই অভিযোগ। কোনও মন্দিরে পূজারিকেই করতে হচ্ছে দেউড়ির কাজ। প্রয়োজনে মালিদের দেউড়ির কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে তাঁদের দিয়ে গার্ডের কাজও করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই অবস্থা চলতে থাকলে অচিরেই মদনমোহন বাড়ির সুন্দর বাগান জঙ্গলে পরিণত হবে বলে শঙ্কিত অনেকেই। কর্মীসংখ্যা এভাবে কমতে থাকলে মন্দিরগুলোর নিত্যপূজা এবং অফিসের কাজেও ব্যাঘাত ঘটবে বলে ট্রাস্টের অভিমত।

স্বয়ংশাসিত এই সংস্থাটি থাকলেও ১৯৮৮ সালে এটি পর্যটন দপ্তরের অধীনে চলে যায়। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কয়েকজন অভিযোগ করলেন, তারপর থেকে এযাবৎ এই ট্রাস্ট বোর্ড চালাতে কোনওরকম অসুবিধা হয়নি তাঁদের। কিন্তু ২০১১ সালে নতুন সরকার আসার পর প্রথম দিকে ঠিকঠাক চললেও বছর দুয়েক যাবৎ চূড়ান্ত অর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডকে।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে ৭টি শিব মন্দির, একটি মাজারসহ ২২টি মন্দির। এর মধ্যে বেনারস ও বৃন্দাবনের মন্দিরও রয়েছে। প্রথা অনুযায়ী সব ক'টি মন্দিরেই নিত্যপূজা ছাড়া নানা অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। সেসবের খরচ ছাড়াও মন্দিরগুলো

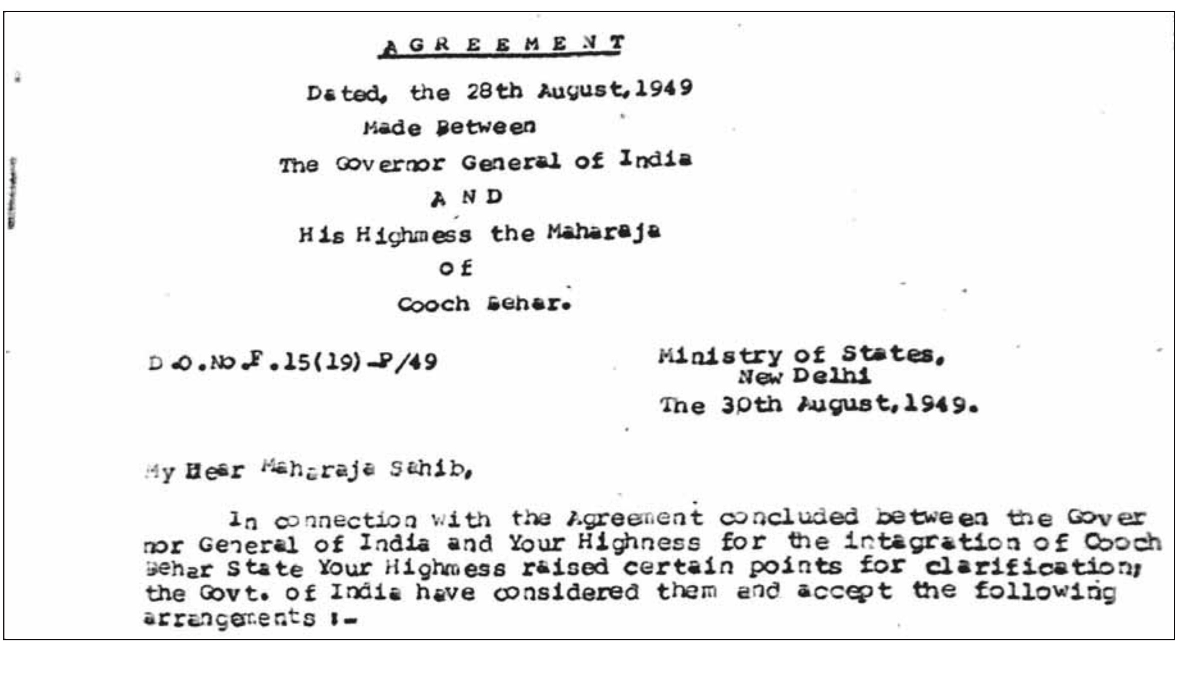
AGREEMENT

Dated, the 28th August, 1949
Made Between
The Governor General of India
AND
His Highness the Maharaja
of
Cooch Behar.

D.O.No.F.15(19)-P/49

Ministry of States,
New Delhi
The 30th August, 1949.

My Dear Maharaja Sahib,

In connection with the Agreement concluded between the Governor General of India and Your Highness for the integration of Cooch Behar State Your Highness raised certain points for clarification; the Govt. of India have considered them and accept the following arrangements :-

বাইরের রাস্তার আলোর বিলও মেটাতে হচ্ছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডকে। জেলখানা থেকে সাগরদিঘি পর্যন্ত হাইমাস্ট এলইডি লাইটের বিল, যা পুরসভার মেটানোর কথা তা প্রণামির টাকায় মেটাচ্ছে বোর্ড। জানা গিয়েছে, ছ'মাসের আলোর বিল মেটাতে না পারার জন্য বেশ কয়েকবার মন্দিরের সংযোগ কেটে দেবার জন্য লোক এসেছিল।

(8) The Management of the temples and Debutter properties in the State may be entrusted to a Trust which shall consist of Your Highness as President, 3 nominees of Your Highness and 2 nominees of GOvernment. This Trust will be in charge of all temples in the State and will also administer the properties of the temples both inside and outside the State. In the event of the abolition of the Zamindaris which are Debutter Property Government will ensure that the Trust has adequate resources to fulfil its object.

Contd....p/2

With kind regards.

Yours sincerely,

V.P.Menon.

Lieutenant-Colonel His Highness
Maharaja Sir Jagaddipendra Narayan
Bhup Bahadur, K.C.I.E., Maharaja
of Cooch Behar, Cooch Behar,
(Bengal).

'মার্জার এগ্রিমেন্ট'-এর নির্বাচিত তিনটি অংশ

রক্ষণাবেক্ষণের খরচ তো রয়েইছে। আর রয়েছে কর্মীদের বেতন। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি সাহায্য ঠিকমতো না আসায় স্বভাবতই সংকট চরমে উঠেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কর্মীদের বেতন বাবদ বছরে লাগে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। নিত্যপূজা মাসে ২ লক্ষ করে বছরে ২৪ লক্ষ। রাস উৎসবে ৩ লক্ষ। দুর্গা পূজায় ৪০ হাজার। শিব মন্দিরগুলো রং করাতে ৩ লক্ষ। রিপেয়ারিং, মেনটেনেন্স, রং করা ইত্যাদি সব মিলিয়ে ১০ লক্ষ। কবিরাজ খানার ওষুধ তৈরির জন্য ৫০ হাজার, বেনারস বৃন্দাবনের নিত্যপূজা, বিদ্যুৎ বিল, জলকর, পুরসভা কর বাবদ ৫ লক্ষ। এ ছাড়া শ্রাবণ উৎসব, শিবরাত্রি, মনসা পূজা, কন্দর্প পূজা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা ইত্যাদি বাৎসরিক বিশেষ পূজায় ১০ লক্ষ টাকা। এসব ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের খরচ তো রয়েইছে।

বছরের শুরুতে ট্রাস্ট থেকে একটি খরচের বাজেট পাঠানো হয়। সেই অনুযায়ী সরকারও একটা বাজেট করে ট্রাস্টের টাকা তিন ধাপে পর্যটন বিভাগকে দেয়। এ বছরও টাকা বাজেটে মঞ্জুর করে পাঠানো হয়েছে পর্যটন বিভাগকে। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে এই টাকা দেবত্র ট্রাস্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছে না। ২০১৫-র জুলাই মাসের পর থেকে এই টাকা পুরোপুরি বন্ধ। ফলে নিয়মিত বেতন হয় না কর্মীদের। গত জুন মাসের বেতন জুলাই মাসের শেষেও তাঁরা হাতে পাননি বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় সংস্থার আয় বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হচ্ছে বোর্ডকে। এই উদ্দেশ্যে বেনারসের হাওয়ামহলকে সংস্কার করা হয়েছে। হাওয়ামহল ও কালীবাড়ি থেকে বাৎসরিক আয় ৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। আনন্দময়ী ধর্মশালার খরচ বাদ দিয়ে আয় ৫ লক্ষ টাকা। কবিরাজ খানা থেকে ১৫ হাজার, বৈরাগী দিঘি লিজ দিয়ে ১ লক্ষ ৫ হাজার ২ টাকা। ডাঙ্গরাই দিঘি ৬৭ হাজার টাকা, অন্য ছোট দুটো পুকুর থেকে ৬ হাজার টাকা। প্রণামি বাক্স থেকে ৮-১০ লক্ষ টাকা এবং পুজোর কুপন বাবদ আয় ১৪/১৫ লক্ষ টাকা। আয় বাড়াতে মন্দিরের সামনে চালু হয়েছে পার্কিং ফি। সেখান থেকে খরচ বাদ দিয়ে মাসে ১০ হাজার টাকা আয় হচ্ছে বলে দেবত্র ট্রাস্ট সূত্রে জানা গিয়েছে। এ ছাড়াও আগামীতে মন্দিরের বাইরে জুতো খুলে রেখে ঢোকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সেখান থেকেও সামান্য আয় হবে বলে জানা গিয়েছে। মন্দিরে অনলাইন পুজো দেবার জন্য একটা ওয়েবসাইটও খোলা হয়েছিল, কিন্তু তা তেমন জনপ্রিয় হয়নি। মন্দিরের প্রণামি থেকে পাওয়া ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করা আছে। এ ছাড়া ট্রেজারিতে রয়েছে ঠাকুরদের কিছু গয়না।

স্বভাবতই দেখা যাচ্ছে, যেখানে কর্মীদের বেতন মেটাতেই ২ কোটির উপর খরচ হয়, সেই অবস্থায় এই সামান্য আয় দিয়ে সব খরচ চালাতে গিয়ে কার্যত ধুঁকছে পর্যটন বিভাগের অধীনস্থ এই সংস্থা। অভিযোগ, যেখানে কর্মীদের বেতন অনিয়মিত আসছে, যেখান মন্দিরের নিত্যপূজার খরচ চালাতে হচ্ছে প্রণামির টাকায়। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে মন্দির সংলগ্ন এলাকা ছাড়াও বাইরের রাস্তার আলোর বিলও মেটাতে হচ্ছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডকে। জেলখানা থেকে সাগরদিঘি পর্যন্ত হাইমাস্ট এলইডি লাইটের বিল, যা পুরসভার মেটানোর কথা তা প্রণামির টাকায় মেটাচ্ছে বোর্ড। জানা গিয়েছে, ছ'মাসের আলোর বিল মেটাতে না পারার জন্য বেশ কয়েকবার

মন্দিরের সংযোগ কেটে দেবার জন্য লোক এসেছিল। গত জুন মাসে বোর্ডের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ পর্ষদকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে, আর্থিক সমস্যা না মেটা পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল মেটানো যাবে না। সেখানে বিদ্যুৎসংযোগ না কাটার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ। এ বিষয়ে জেলাশাসক পি উলগানাথনের যুক্তি, এটা কোনও সমস্যা নয়। মন্দিরের বাইরের আলোর টাকা যদি ট্রাস্ট বোর্ড মেটায়, তাতে ক্ষতি কী? যাঁরা মন্দির দর্শন করতে আসছেন, তাঁরা যদি দূর থেকে আলো পান, তবে তো সেটা জনসেবামূলক কাজ হল। মদনমোহন মন্দির তো কোচবিহারের সবার, তাহলে শুধু ওই এলাকার মানুষই আলো পাবে কেন? তবে আমরা এর মধ্যেই আলোচনা করেছি, কিছুদিনের মধ্যেই পুরসভাকে এই আলোটা হস্তান্তর করে দেওয়া হবে। এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীর কাছে জানা গেল, সাগরদিঘি আমতলা থেকে শুনশুনি বাজার পর্যন্ত নতুন একটি কানেকশন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের নামে জমা পড়েছে নতুন করে।

কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে কত জমি রয়েছে, তার সঠিক ল্যান্ড শিডিউল কোথাও পাওয়া যায় না। ফলে শহরের দিঘিগুলি ঠিক কাদের অধীনে রয়েছে তা নিয়ে একটা সংশয় ছিল। পুরনো নথি ঘাঁটতে গিয়ে ট্রাস্ট বোর্ড কর্মীদের নজরে আসে, একমাত্র বৈরাগী দিঘি কালেক্টরের খতিয়ানভুক্ত— অন্য সব ক'টা মৎস্য দপ্তরের অধীনে রয়েছে। এর পরই ট্রাস্ট বোর্ড রেকর্ড সংশোধনের জন্য আবেদন করে। ২১/৯/২০১১ রায় ট্রাস্ট বোর্ডের পক্ষে যায়। অবশেষে বোর্ডের অধিকারে আসে সুনীতি দীঘি। যদিও এ নামে কোচবিহারের ৯৯ শতাংশ লোক একে চিনতে পারবে না তা হলফ করে বলা যায়। আমরা এক ডাকে যাকে বৈরাগী দিঘি বলে জানি, তারই পোশাকি নাম সুনীতি দিঘি। ৪,৪১০ একরের বিশাল এই দিঘি আপাতত লিজে। বাকি তিনটি দিঘির জন্য বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তার অধিকারের নিষ্পত্তি হয়নি। তেমনি বারাণসীর লোলার্ক কুণ্ড আজও দখলদারের অধীনে। সেই সম্পত্তিও প্রায় বেহাত হবার উপক্রম হয়েছে।

> আলো ও শব্দের আধুনিক প্রযুক্তিতে বৈরাগী দিঘির মধ্যে থেকে উঠবেন মদনমোহন। দর্শকরা টিকিট কেটে জালের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে এই দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন। বহুদিন আগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও শুরু হয়নি কাজ। বহু টাকার যন্ত্রপাতি আপাতত পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে আনন্দময়ী ধর্মশালার প্রাঙ্গণে।

কোচবিহারের বুকে কবিরাজবাগান বাদুড়বাগানে পরিণত ও অবহেলিত, অযত্নে পড়ে আছে। এই বাগানের দেখভালের জন্য বন দপ্তরকে চিঠি পাঠিয়েছে ট্রাস্ট বোর্ড। কিন্তু প্রশাসন থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি— সকলেরই উদাসীনতার ফলে আজও একজন দখলদার কবিরাজবাগানের একাংশে দিব্যি ঘরবাড়ি বানিয়ে বসবাস করছে। বড়দেবী বাড়ি মন্দিরের পিছনের জমিও দখলদারের অধীনে। খতিয়ান দেবত্রর নামে থাকলেও শনি মন্দির আজ প্রায় হাতছাড়া।

ট্রাস্ট বোর্ডের আয়ের উৎস বাড়ানোর জন্য সরকারের পক্ষে কিছু পদক্ষেপ নেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বৈরাগী দিঘির দক্ষিণ ঘাটে পর্যটন দপ্তরের সহায়তায় একটি লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো-এর ব্যবস্থা করা হবে। আলো ও শব্দের আধুনিক প্রযুক্তিতে বৈরাগী দিঘির মধ্যে থেকে উঠবেন মদনমোহন। দর্শকরা টিকিট কেটে জালের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে এই দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন বলে জানান অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা পর্যটন দপ্তরের যুগ্মসচিব সুনীল আগরওয়ালা। বহুদিন আগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও শুরু হয়নি কাজ। বহু টাকার যন্ত্রপাতি আপাতত পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে আনন্দময়ী ধর্মশালার প্রাঙ্গণে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস কার্যত ঘাসে ঢেকে গিয়েছে। পরিকল্পনা আর বাস্তবায়নের পথ অতিক্রম করতে এত সময় লাগার উত্তর সকলেরই অজানা।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অফিসে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা হল প্রবাল মুন্সীর সঙ্গে। জানা গেল, গত বছর অর্থাৎ ২০১৫-র রাসমেলার সময় মদনমোহন মন্দির প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রং করেছিলেন তিনি। কথা ছিল, কাজ শেষ হবার পর সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এক মাসের মধ্যে টাকা পাবার। কিন্তু বছর ঘুরতে চললেও তাঁর প্রাপ্য প্রায় সাড়ে ৪ লাখ টাকা আজও তিনি পাননি। একই অবস্থা গত বছর দুর্গা পুজোয় বড়দেবী বাড়ি যিনি রং করেছেন, তাঁরও। তবে তাঁর প্রাপ্য ৪৩ হাজার টাকা। এরকমই বকেয়া পড়ে রয়েছে দুর্গা পুজো, নিত্যপুজোয় যারা কবুতর, পাঁঠা, মোষ, শূকর সরবরাহ করে, তাদের। যিনি সব অনুষ্ঠানে প্যান্ডেলের দায়িত্বে থাকেন, তাঁরও বকেয়া প্রচুর। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ২০১৪-র কিছুটা এবং ২০১৫, ২০১৬-র প্রায় সব বিলই বকেয়া পড়ে রয়েছে। ট্রাস্টের কর্মীদের কাছে পাওনাদাররা এসে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। নিত্যপূজায় যাঁরা ভোগের চাল, ডাল, তেল, মশলা, কাঠ, ফল, মিষ্টি সরবরাহ করে, প্রত্যেকেই কমবেশি ২ থেকে ৪ লাখ টাকা করে পান ট্রাস্ট বোর্ডের কাছে। তবুও একমাত্র মদনমোহনের দিকে তাকিয়ে

ঘাসে ঢেকে যাচ্ছে অবহেলায় পড়ে থাকা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো-এর যন্ত্রপাতি

অজ পর্যন্ত কেউ তাঁদের সরবরাহ বন্ধ করেননি।

অথচ দুঃখের বিষয়, কোচবিহারের মানুষের এই অনুভূতি, এই স্পিরিটটাই ধরতে পারছেন না বর্তমান সরকারের আমলারা। মদনমোহন এখানকার মানুষের কাছে শুধু একটা বিগ্রহ নয়। মানুষের অনুভূতিকে বুঝে সরকারের উচিত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। ট্রাস্টের দখলিকৃত জমি পুনরুদ্ধার করে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আয় বাড়ানো যেতে পারে। তবে তা কখনওই কোচবিহারের সৌন্দর্য নষ্ট করে নয়, মতামত জানাচ্ছেন শহরের বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী মানুষরা।

যদিও কোচবিহারের জেলাশাসক পি উলগানাথন রাজার আমলের 'মার্জার এগ্রিমেন্ট'কে আজ আর আগের মতো গুরুত্ব দিতে রাজি নন। তাঁর মতে, আর এভাবে সরকারের পক্ষে টাকা দেওয়া সম্ভব নয়, ট্রাস্ট বোর্ডকে ভবিষ্যতে নিজের খরচ নিজেই চালাতে হবে। আর সেটা অসম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করেন। সেই অনুযায়ী আগামীতে ট্রাস্টের জমিতে শপিং কমপ্লেক্স-সহ বেশ কিছু পরিকল্পনা নিচ্ছেন বলেও জানান তিনি। তিনি জানালেন, ট্রাস্ট বোর্ডকে তিনি এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চান, যেখানে বোর্ডকে কারও সাহায্য দরকার হবে না, বোর্ডই অন্যকে সাহায্য করার মতো জায়গায় থাকবে। পাশাপাশি ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মীসংখ্যা কমিয়ে ১০০ করার পরিকল্পনার কথাও বলেন তিনি।

যদিও এর ঠিক উলটো কথা শোনা গেল পর্যটন দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর সুনীল আগরওয়ালার গলায়। তিনি বলেন, দেবত্রর বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন। এ ধরনের সমস্যা যাতে আর না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা হচ্ছে। সমস্যা মিটে যাবে। ট্রাস্ট বোর্ডকে অর্থসাহায্য বন্ধ করার মতো কোনও সিদ্ধান্ত পর্যটন দপ্তর থেকে নেওয়া হয়নি। আর দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সরকারি প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও এ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সদর মহকুমাশাসক অরুন্ধতী দে।

সামনে দুর্গা পুজো। আবার মন্দির রং করা, মোষ-শূকর জোগাড় করা, বকেয়া না মেটাতে পারলে কী করে পুজোর ব্যবস্থা করবেন তা নিয়ে চিন্তিত হলেও ট্রাস্ট বোর্ডের বড়বাবু জয়ন্ত চক্রবর্তীর আশা, সকলের সদিচ্ছায় এবং হস্তক্ষেপে এই পাহাড়প্রমাণ সমস্যার সমাধান অবশ্যই হবে। ট্রাস্ট বোর্ডকে রাজ্য সরকার আর টাকা দিতে পারবে না বলে এ ধরনের লিখিত বা মৌখিক কিছু আজ পর্যন্ত তাঁরা পাননি বলে জানান ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ। তাঁরাও চাইছেন নিজেদের আয় কিছুটা বাড়িয়ে সরকারকে একটু সাহায্য করতে। মদনমোহনের নিত্যপূজায় অনটনের খবর দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশের পর কোচবিহারের তিনজন ব্যবসায়ী এই খরচ বিনা শর্তে চালাতে আগ্রহী হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও তা নেওয়া হয়নি।

বর্তমানে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের একমাত্র জীবিত নমিনি আছেন প্রসেনজিৎ বর্মন। ট্রাস্ট বোর্ডের ছ'জন সদস্যের মধ্যে সরকারি পক্ষের দু'জন থাকলেও আরও তিনটি সদস্যপদ ফাঁকা। এ নিয়ে বেশ ক'টি মামলা হলেও প্রসেনজিৎবাবুর ভ্যালিডিটি নিয়ে করা মামলা ধোপে টেকেনি। আর উত্তরসূরির সমস্যাও মেটেনি। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট এবং তিনজন নমিনির পদ শূন্য হয়ে গেলে এই দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের যৌক্তিকতাই একটা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়বে। তিনিও চান এই শূন্যপদগুলি দ্রুততার সঙ্গে পূরণ করা হোক। ট্রাস্ট বোর্ডের এই সংকটকালীন অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ভারতীয় সংবিধানের ৩৬২ নং আর্টিকল অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যের রাজাদের 'রাইট' এবং 'প্রিভিলেজ' চলে গেলেও 'মার্জার এগ্রিমেন্ট' অনুযায়ী দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬৬ সালে যে 'কোচবিহার রিলিজিয়াস ট্রাস্ট রুল' প্রণয়ন করে তা কখনওই বাতিল হতে পারে না। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের পরিচালনার ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বোর্ড এবং রাজ্য সরকারকে দুটোর উপর ভিত্তি করেই কাজ করতে হবে। তবে ট্রাস্টের নিজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য নানারকম পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আশা করি, শীঘ্রই সবকিছু আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

এক সময়ের দেশীয় রাজ্য আজ পশ্চিমবঙ্গের একটা জেলায় পরিণত হলেও তার গরিমা আজও অক্ষুণ্ণ। কোচবিহারের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে অতীত ইতিহাসের নানা স্মৃতি, যা মোছা সহজ নয়। তাই আর পাঁচটা জেলার সঙ্গে একে এক রেখায় দাঁড় করানোটা ঠিক হবে না বলে মনে করেন কোচবিহারবাসী। তাঁদের অভিমত, মনে রাখতে হবে, 'মার্জার এগ্রিমেন্ট'এখনও বাতিল হয়নি। সেই কারণে তাঁদের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের নিজের ভাঁড়ারে টান খুব একটা ভাল চোখে দেখছেন না কোচবিহারের সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ। ১৯৯৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মদনমোহন চুরি হবার সেই কালো দিন কোচবিহারবাসীর স্মৃতিতে আজও তাজা। চুরির কোনও কিনারাই হয়নি। তেমনই দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের টাকা নয়-ছয় হওয়া নিয়ে নানা মহলে কানাঘুসোও শোনা যায়। অবশ্য সে সবকিছুই খতিয়ে দেখার বিষয় প্রশাসনের। কিন্তু সাধারণ মানুষের দাবি, ট্রাস্ট বোর্ড নিজেদের আয় বাড়ানোর চেষ্টা করুক, যাতে তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় বেশ কিছু খরচ সামলাতে পারে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারও নিয়মিত বাকিটা সাহায্য করুক। এতগুলো মন্দিরের নানা ধর্মীয় রীতি এত বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড। আগামীতেও তাঁরা যেন এভাবেই কাজ করে যেতে পারেন। এভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে চলুক। আবার প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের ঘুম ভাঙুক নহবতখানার ভোরের সানাইয়ের সুরে।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল উত্তরের ভূমিপুত্ররা

১৯৪২ সালের ৯ অগাস্ট জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি আওয়াজ দিয়েছিলেন 'ইংরেজ, ভারত ছাড়ো'। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসীর উত্তাল আন্দোলনে সংগঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'। উত্তরবঙ্গের মাটিতেও অজানা, অখ্যাত, অনামী স্বাধীনতা যোদ্ধা, যাঁরা 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য/ চিত্ত ভাবনাহীন' হয়ে স্বাধীনতার এই লড়াইয়ে শামিল হয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন আদিবাসী জনজাতি, রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত, নিম্নবিত্ত উত্তরের ভূমিপুত্র। ঔপনিবেশিকতাবাদীদের ইতিহাসে তাঁরা উপেক্ষিত, অনাদৃত। এমনকি স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাসেও তাঁদের স্থানলাভ ঘটেনি। মহাত্মা গান্ধির ডাকে যেমন কুমারগ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্ফুরণ ঘটেছিল, তেমনি দলাদলির মঘা দেওয়ানির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং ভূমিকা এলাকার অসংখ্য বিপ্লবীকে সংঘবদ্ধ করে, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তিম দিন পর্যন্ত সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যন্ত এলাকার অনেক বিপ্লবী জেল খেটেছেন, জেল থেকে ফিরে এসে আবারও স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। স্বাধীনতালাভের পরে দু'-একজন স্বাধীনতা যোদ্ধা ভাতা পেলেও বাকিদের নেতারা খোঁজ নেননি বা ভাতা পাননি। তবে তাঁরা স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, স্বাধীন ভারত দেখে যেতে পেরেছিলেন।

প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক অশেষ দাস উত্তরের ভূমিপুত্রবান্ধব। দীর্ঘদিন ধরেই আদিবাসী-উপজাতি সমাজকে নিয়ে কাজ করছেন। তাঁর মতে, জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সের বা ব্যাপকতর উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচা পত্তনের প্রথম পর্ব থেকেই এখানে বিহারের ছোটনাগপুর, রাঁচি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এসেছে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। কালক্রমে কয়েক পুরুষ বসবাসের ফলে এইসব আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষও এখানে স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। অসাম্যের বিরুদ্ধে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে— পরাধীন ভারতেও তাঁরা নানা প্রকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, নেতৃত্বও দিয়েছেন। চা শ্রমিকদের মধ্যে সাঁওতাল, খাঁড়িয়া, ওরাওঁ, মুন্ডা , হো, নাগেশিয়া, চিকরবাইক, মালপাহাড়িয়া প্রভৃতি আদিবাসী চা শ্রমিক বা কৃষক যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তেমনি পোয়াতু বর্মনের মতো রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ, দেবেন দাসের মতো রাজসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ, ইশোর সিং বসুমাতারি বা যোগেন্দ্রনাথ মুশাহারি বা যোগেন বাগানিয়ার মতো মেচ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের আন্দোলনে কেঁপে উঠেছিল উত্তরের ভূখণ্ড। বিশেষত ডুয়ার্স, কামাখ্যাগুড়ি, কুমারগ্রামদুয়ার মিলেমিশে থাকত আদিবাসী, রাজবংশী, বাঙালি-অবাঙালিরা। একে অপরের সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত, দুঃখ-সুখ ভাগাভাগি করে নিত। কিন্তু স্বাধীনতার সত্তর বছর পরে আদিবাসীরা উন্নয়নের প্রশ্নে গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত।

উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে শিলিগুড়ি তথা তরাইয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিপুত্রদের কথা প্রসঙ্গে এসি কলেজের অধ্যাপক সুজিত ঘোষের মতে, অসহযোগ আন্দোলন পরবর্তীকালে যখন ১৯২৯ সালে ভয়ংকর মন্দা এবং ব্রিটিশ সরকারের শোষণের ফলে ভারতবাসীর সহ্যশক্তি ভেঙে গিয়েছে, ঠিক তখনই ১৯৩১ সালে আইন অমান্য গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে দেশব্যাপী উত্তাল গণ-আন্দোলনের আঁচ তদানীন্তন শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছাতে পারেনি।

চা-বাগানগুলিতে ব্রিটিশ সরকারের চেয়ে অনেক বেশি শোষণ অব্যাহত রয়েছে।

প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক এবং গবেষক উমেশ শর্মা উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোকপাত করেছেন তাঁর প্রবন্ধগুচ্ছতে। তাঁর মতে, ১৮৬৪ সালে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরবর্তী স্তরে ১৮৬৫ সালে সিঞ্চুলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নগ্ন খেলা শুরু হয়। কোচবিহাররাজের পক্ষে যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে ইংরেজ কোচবিহাররাজকে বিস্তীর্ণ ডুয়ার্স এলাকা ফেরত না দিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রয়োজনে। ১৮৬৯ সালের ১ জানুয়ারি পশ্চিম ডুয়ার্স নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হয়। এই সময়কালে ডুয়ার্স অঞ্চলে চা-বাগান পত্তনের জন্য বৃক্ষ সংহার করে কুলিকামিন, সাহেব-মেমদের নিয়ে শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ গড়ে উঠতে থাকলে, জীবন ও জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন মুলুক থেকে মানুষজন, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। যোগাযোগবিহীন, বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর এবং শ্বাপদসংকুল অবহেলিত জনপদ জলপাইগুড়ি তথা ব্রিটিশশাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের ডুয়ার্স শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সর্ববিষয়েই পিছিয়ে ছিল অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে। অর্থনৈতিক নানাবিধ সমস্যার মধ্যে থাকার ফলে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন জাগরূক হয়েছিল অনিবার্যভাবেই। এই অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি চা-বাগান পত্তনের পরবর্তীকালে আগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদিবাসী ভাইদের মধ্যেও স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের স্বপ্ন মাথাচাড়া দিচ্ছিল। আর সেই কারণেই ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাকামী মানুষের আন্দোলনে প্রত্যন্ত এই অঞ্চলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষও শামিল হয়েছিল।

উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে শিলিগুড়ি তথা তরাইয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিপুত্রদের কথা প্রসঙ্গে এসি কলেজের অধ্যাপক সুজিত ঘোষের মতে, অসহযোগ আন্দোলন পরবর্তীকালে যখন ১৯২৯ সালে ভয়ংকর মন্দা এবং ব্রিটিশ সরকারের শোষণের ফলে ভারতবাসীর সহ্যশক্তি ভেঙে গিয়েছে, ঠিক তখনই ১৯৩১ সালে আইন অমান্য গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে দেশব্যাপী উত্তাল গণ-আন্দোলনের আঁচ তদানীন্তন শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছাতে পারেনি। কারণ, সেই সময়ে শিলিগুড়ির জনসংখ্যা ছিল একেবারেই কম। রেলের কর্মচারী, চা-বাগানে কর্মরত বাবু, আইন ব্যবসায়ী, জঙ্গলের ঠিকাদার, কিছু ভাগ্যান্বেষী মানুষজন নিয়ে গড়ে উঠেছিল শিলিগুড়ির বুদ্ধিজীবী সমাজ। শিলিগুড়িতে সমাজ গঠনের একটা পরিবেশও মূলত তাঁরাই তৈরি করেছিলেন। সেই সময়ে যাঁরা দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কিংবা ইস্ট বেঙ্গল রেলের কর্মী হিসেবে শিলিগুড়ি এসেছিলেন, তাঁরা পাহাড় ও সমতলের নানা স্থানে কর্মরত থাকলেও ঘরবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন শিলিগুড়িতে। এঁদের কারও মধ্যেই স্বদেশচেতনা তেমন ছিল না কিংবা থাকলেও জীবনযাপনে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকায় কেউই সাহস করে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতেন না। সত্যাগ্রহ, বিলিতি বর্জন বা আইন অমান্য আন্দোলনেও কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতায় বারোমিশালি মানুষের বসতি শিলিগুড়িতে সঠিকভাবে এবং সার্বিকভাবে জনমত গড়ে ওঠেনি। ১৯৩৫-৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক শাখার ব্যাপারে অসংগঠিতভাবে চা-বাগানে শ্রমিক সংগঠন তৈরির ভিতর দিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমায় রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। চা-বাগান এলাকায় চা শ্রমিকদের উপর ইংরেজ ও বাঙালি মালিকদের অত্যাচার ও শোষণের কাহিনি বাইরে প্রচারিত হত বটে, তবে মালিকদের কঠোর সতর্কতার জন্য রাজনীতি বা শ্রমিক সংগঠন গড়ার উদ্দেশ্যে বাইরের লোক চা-বাগানে প্রবেশ করতে পারত না বলে রাতের অন্ধকারে শ্রমিক নেতারা গোপনে বাগিচার লেবার লাইনে প্রবেশ করে শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করতেন। ফলে ওই সময়ে শিলিগুড়ি জনপদের শিক্ষিত সমাজের চেয়ে চা শ্রমিকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা গড়ে ওঠে। শ্রমিক আন্দোলন এবং পাশাপাশি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার কাজে ছিলেন কংগ্রেস নেতা চারু মজুমদার, নৃপেন বসু প্রমুখ। তখন সব সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে শিলিগুড়ি জনপদের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ-ছয় হাজার। শিলিগুড়ির তিলক ময়দান থেকে ১৯৪২ সালের অগাস্ট মাসে বীরেশ্বর মজুমদারের নেতৃত্বে এক বিশাল মিছিল শিলিগুড়ি থানা ঘেরাও করে। এক ফালি টিনে ছাওয়া একটা ঘরে সাধারণ লাল পাগড়িধারীদের কাছে থানা ঘেরাওয়ের আগাম খবর না থাকায় রণক্ষেত্র বেধে যায়। শহর জুড়ে শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়। কংগ্রেস কর্মীরা একে একে আত্মসমর্পণ করে।

চা শ্রমিক তথা আদিবাসী জনজাতিদের নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত। ডুয়ার্সের অন্যতম ভূমিপুত্র এই গবেষকের পর্যবেক্ষণ, উত্তরের ভূখণ্ডের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্সসহ সুদূর গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষ তথা আদিবাসী মানুষের মধ্যেও পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার বিষয়ে যে জাগরণ তৈরি হয়েছিল, তার গুরুত্ব অপরিসীম। কুমারগ্রামদুয়ার থানাতে ব্রিটিশ প্রশাসনের আত্মসমর্পণ এবং স্বাধীনতা যোদ্ধাদের বিজয় ঘোষণা, হাট বন্ধ আন্দোলন, চা শ্রমিক আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে তেভাগা আন্দোলনে এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের ভূমিকা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। ডুয়ার্সের তেমনি একটি উল্লেখযোগ্য নাম লালশুকরা ওঁরাও। একাধারে চা শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। তেভাগা আন্দোলনসহ স্বাধীনতা আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ এসব এলাকায় পড়ার আগে চা শ্রমিকদের মধ্যেই প্রথম ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে ‘টানা ভগৎ’ নামে রাঁচি জেলার সাঁওতালদের একটি আন্দোলনের উত্তাপ ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কারভিত্তিক এই আন্দোলন ক্রমেই

জমিদার-মহাজন-চা-বাগিচা মালিক এবং ব্রিটিশ সরকারবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। চা-বাগিচাগুলিতে ধনতান্ত্রিক শোষণ এবং অন্যায় জুলুম ও অত্যাচারের বদলা হিসেবে কর্তৃত্বের প্রতি বিরোধিতা, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক অসন্তোষের সঙ্গে ধর্মীয় চাহিদাকে যুক্ত করে অন্দোলনের রূপরেখা তৈরি হয়। এই আন্দোলন ইউরোপীয় চা-কর এবং ব্রিটিশ শাসকদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। ১৯১৬ সালে ডুয়ার্সের হাতিপোতা চা-বাগানে শ্রমিক সমাবেশ ঘটলে ইংরেজ সরকার ব্যাপক ধরপাকড় করে ২৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। লালমোহন বেণী, সুয়া ওঁরাও, জহরু ওঁরাও, মাংরা ওঁরাও, গধনু ওঁরাও, বৈজনাথ মাহালী, চারোয়া ওঁরাও, খেতু মুন্ডা, দেবী ওঁরাও, সোমরা ওঁরাও, ছোসরা ওঁরাও প্রমুখ ১৬ জন শ্রমিককে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে প্রত্যন্ত এই জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সে ১৯২১ সালে যে হাট বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, তাতে রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত মঘা দেওয়ানি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত পশুপতি কুঁয়ার হাট বয়কট অন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কুমারগ্রামের কুলকুলির হাটে ইংরেজ চা-কররা নানা প্রকার জুলুম করত বলে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, সেই আন্দোলনে রাজবংশী, মেচ, রাভা, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পুলিশ মঘা দেওয়ানি এবং পশুপতি কুঁয়ারকে গ্রেপ্তার করে আলিপুরদুয়ার আদালতে নিয়ে এলে প্রায় হাজার দশেক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আদালতে বিক্ষোভ দেখায়। স্বাধীনতা সংগ্রামী আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত দেবেন দাস রাভার জন্ম ১৯০১ সালে কোচবিহার রাজ্যের তুফানগঞ্জের ভারোয়াগ্রামে। যুবক বয়সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংস্পর্শে এসে এই অঞ্চলে তাঁর কর্মকাণ্ড শুরু হয়। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে আজীবন যুক্ত এই স্বাধীনতা যোদ্ধা কুমারগ্রাম থানা দখলের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দেবেন দাস আদালতে আত্মসমর্পণ করলে বিচারে তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হয়। এই আন্দোলনে অন্যান্যদের সঙ্গে রাভা সম্প্রদায়ভুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুশাহারিও এই অঞ্চলের কুমারগ্রাম থানা দখলে এবং খাজনা বয়কট বা বিলাতি দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কুমারগ্রামের হেমাগুড়ি সাহেবপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন হাতিপোতা বাগানের যোগেন্দ্রনাথ মুশাহারি।

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতার প্রেক্ষাপটে বিজেপি জেলা নেতা দীপেন প্রামাণিক মনে করেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট মাতৃভূমি দ্বিখণ্ডিত হলে জলপাইগুড়ির রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটল। দেশকে বিভাজন করার জন্য যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেই সিরিল র‍্যাডক্লিফের কলমের খোঁচা হজম করা সহজসাধ্য ছিল না। জলপাইগুড়ির কোন কোন অংশ পাকিস্তানে যাবে বা হিন্দুস্থানে থাকবে, সেটাই ছিল মূল প্রশ্ন। র‍্যাডক্লিফ বিভাজন সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দিলেও ১৫ অগাস্ট বা তার পূর্বে সেটি প্রকাশ করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই একদিকে মুসলিম লিগ, অন্য দিকে কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের উদ্‌বেগে রাজনৈতিক পরিবেশ ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। ১৭ অগাস্ট র‍্যাডক্লিফের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে জলপাইগুড়ি শহর বাঁচলেও শহরের অর্থনৈতিক প্রাণভোমরা পাঁচটি থানা— বোদা, পাটগ্রাম, পচাগড়, দেবীগঞ্জ ও তেঁতুলিয়া পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। র‍্যাডক্লিফের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে আপাতত রাজনৈতিক উত্তাপ প্রশমিত হলেও তা ছিল নিতান্তই সাময়িক। কিছুদিনের মধ্যেই উদ্‌বাস্তু আগমন পশ্চিমবঙ্গের অন্য অংশে অস্থিরতা সৃষ্টি করলেও ভূমির প্রতুলতা এবং স্থানীয় মানুষের সহায়তার ফলে এই জেলায় কোনও সংগঠিত উদ্‌বাস্তু আন্দোলন জন্ম নেয়নি। তবে পূর্ব পাকিস্তানের জেলাগুলিতে ধর্মীয় অস্থিরতার উত্তাপের ফলে ১৯৫০ সালে স্বল্পস্থায়ী দাঙ্গা হয়েছিল, যার প্রভাবে বেশ কিছু অ-হিন্দু জেলা ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যায়। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে বিপুল সংখ্যক উদ্‌বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে এই জেলায় এসে আশ্রয় নিলে জেলার কৃষি অর্থনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোচবিহার রাজ্যের সংযুক্তিকরণ আন্দোলন মাথাচাড়া দেয়। জলপাইগুড়ি সন্নিহিত দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের অভ্যন্তরীণ ভারত-বিরোধী এবং আপাত বাঙালি-বিরোধী আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা চিন্তাশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ভাবিয়ে তুলছিল। জলপাইগুড়ির সর্বস্তরের মানুষ কোচবিহার রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ড. চারুচন্দ্র সান্যাল, শশধর কর, অরুণা দাশগুপ্ত, ড. অবনীধর গুহ নিয়োগী, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র লাহিড়ি, রবীন্দ্রনাথ সিকদার প্রমুখ। কোচবিহারের হিতসাধনী সভা এই অন্তর্ভুক্তি মেনে নিতে না পেরে এরা গোর্খা লিগের সঙ্গে জোট বেঁধে উত্তরখণ্ড প্রদেশ সংঘ নামে পৃথক রাজ্যের নাম ঘোষণা করে। প্রস্তাবিত এই রাজ্যে জলপাইগুড়ি জেলা ছিল। ১৯৫২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দার্জিলিঙে এলে এরা স্মারকলিপি প্রদান করলে জলপাইগুড়িতে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের মালবাজার এবং নাগরাকাটাতে গোর্খা লিগের ঘাঁটি ছিল। তারা রাজ্য না পেয়ে স্বয়ংশাসিত জেলা গঠনের আন্দোলন শুরু করে। জলপাইগুড়ির জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র সোচ্চার ছিলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে জলপাইগুড়ি জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চেয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা নেতৃত্ব গোবিন্দ রায়ের মতে, স্বাধীনতালাভের পর থেকেই রাজনৈতিক সচেতনতার প্রশ্নে জলপাইগুড়ি অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তাই ১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের দু'জন সদস্য সর্দার কে এস পানিক্কর এবং এইচ এন কুঞ্জুরুর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের কাছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং ও সিকিম নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি জানানো হলে জলপাইগুড়ির বাম-ডান রাজনৈতিক নেতৃত্ব এসব বিতর্কে প্রবেশ করেননি। জলপাইগুড়ির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতামতকে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় কোনও সরকারই উপেক্ষা করতে পারেনি। ১৯৫৩ সালে জমিদারি, জোতদারি প্রথার অবসান হলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতুন মেরুকরণ

অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে প্রত্যন্ত এই জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সে ১৯২১ সালে যে হাট বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, তাতে রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত মঘা দেওয়ানি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত পশুপতি কুঁয়ার হাট বয়কট অন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কুমারগ্রামের কুলকুলির হাটে ইংরেজ চা-কররা নানা প্রকার জুলুম করত বলে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, সেই আন্দোলনে রাজবংশী, মেচ, রাভা, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ঘটেছিল। ১৯৫৮ সালে ভারত-পাক সীমান্ত সমস্যা সমাধানে ঐতিহাসিক নেহরু-নুন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে দক্ষিণ বেরুবাড়ির দক্ষিণ অর্ধাংশ পাকিস্তানে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। নেহরু-নুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর চুক্তির প্রতিবাদে এবং বাতিলের দাবিতে বেরুবাড়ি প্রতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে তীব্র গণ-অন্দোলন চলার পর ১৯৭৪ সালে 'ইন্দিরা মুজিব' চুক্তির মাধ্যমে সেই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়। বেরুবাড়ির খণ্ড মৌজাগুলি ভারতের দখলে এবং বেরুবাড়ি মৌজার চারটি শিটের অংশবিশেষ অধুনা বাংলাদেশের দখলে আসে। এই অ্যাডভার্স পজিশনে ১৯৮৯ সাল থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, সীমান্ত সড়ক এবং কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণকালে বেরুবাড়ির খণ্ড মৌজা এলাকাগুলিতে পুনরায় সমস্যা দেখা দেয়। এখনও বেরুবাড়ির হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিক তাদের ভিটেমাটির প্রশ্নে উৎকণ্ঠার সঙ্গেই দিন কাটাচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা ভাগের পর বেরুবাড়ি একটি সীমান্তবর্তী এলাকায় পরিণত হয়েছে এবং স্বাধীনতার পর থেকে ভারত-পাক অধুনা ভারত-বাংলাদেশ সীমানা বিষয়ে বেরুবাড়ি এলাকায় এখনও জটিল সমস্যা রয়েছে।

অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার কৃষি অর্থনীতি এবং কৃষক বিক্ষোভের পাশাপাশি চা শ্রমিক আন্দোলনের নির্যাস পাওয়া গেল কমিউনিস্ট নেতা তথা চা শ্রমিকদের দুঃখ-বিপদের সাথি জিয়াউল আলমের সঙ্গে আলাপচারিতায়। তাঁর মতে, জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ জোতদার ছিলেন রাজবংশী ক্ষত্রিয় এবং মুসলিম। রাজবংশী জোতদার সমাজ তথা রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ ছিল সম্পূর্ণভাবে ভূমিনির্ভর সমাজ। তাদের অন্য কোনও বিকল্প জীবিকা না থাকার ফলে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের প্যাঁচে ভূমি হারিয়ে এদের একটা অংশ সরকার বিরোধী হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। ১৯৫৭ সালে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির কেন্দ্রীয় অধিবেশনে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে, উদ্‌বৃত্ত জমি বণ্টন কমিটিতে একজন রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিনিধিকে যেন সরকার রাখে। তা ছাড়া বলা হয়, ভূমিনির্ভর ক্ষত্রিয় সমাজের সঙ্গে অন্য জেলার জমিদারদের তুলনা করলে তা যুক্তিসংগত হবে না। জলপাইগুড়ির ক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে উপেন্দ্রনাথ বর্মন, সতীশচন্দ্র সিংহ রায়, উমেশচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ এই দাবি উত্থাপন করলেও সরকার এই দাবির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। গুরুত্ব দিলে বোধহয় জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হত। তাই স্বাধীনতালাভের পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারত সরকার জমিদার ও জোতদারদের একাংশের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারল না বলে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে শুরু করল।

ঠিক এই সময়ে তেভাগা আন্দোলনের প্রাক্কালে বাংলার মাটিতে ঘটে যায় পঞ্চাশের মন্বন্তর। বুভুক্ষু মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। গ্রামের পর গ্রাম, গঞ্জের পর গঞ্জে ক্ষুধার তাড়নায় মারা যায় খেতমজুর, ভাগচাষি, কামার, কুমোর, ছুতোর, জেলেসহ লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষ। ইংরেজশাসিত বাংলাদেশে ১৯৪৬-৪৭ পর্যন্ত সময়কালে জোতদার এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয় তেভাগা আন্দোলন। উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগচাষি বা আধিয়ার কৃষকদের দিতে হবে, ভাগচাষিদের তাদের আবাদিকৃত জমির উপরে দখলস্বত্ব দিতে হবে, জমির মালিক অর্থাৎ জোতদার বা জমিদারের বাড়ির গোলায় ধান অথবা অন্য কোনও প্রকার ফসল তোলা যাবে না, এবং সমস্ত ফসলই ভাগচাষিদের হেপাজতে রাখতে হবে। বলা হয়, হরেকরকম আদায় ভাগচাষিদের কাছ থেকে নেওয়া চলবে না, এবং আবাদযোগ্য যে কোনও পতিত জমিতে ভাগচাষিদের ফসল করবার অধিকার দিতে হবে ও ভাগচাষিদের জমি থেকে ইচ্ছানুসারে উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। এই ক'টি শর্তেই তেভাগা আন্দোলনের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছিল।

ভাগচাষি, কৃষক ও গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের বিশাল একটি অংশ তেভাগা আন্দোলনের আওয়াজ তোলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর বুভুক্ষু ও ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে জাতি, ধর্ম ও ভাষা ভুলে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ভারতের উপনিবেশবাদীদের কাঁপিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে ইরেজ প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে যারা দেশের গরিব মানুষদের তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করত, তাদের বিরুদ্ধেও ধীরে ধীরে কৃষকসভার নেতৃত্বে কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করে। জাতপাতের প্রশ্ন নিয়ে যখন গোটা ভারতবর্ষ উত্তাল, সমগ্র দেশের বিভিন্ন এলাকায় জাতপাতের প্রশ্নে রক্তের হোলি চলছে, ঠিক সেই সময়ে দরিদ্র মানুষের মেলবন্ধনের রাজনীতি শুধুমাত্র ইংরেজ শাসকদেরই ঘাবড়ে দেয়নি, ঘাবড়ে দিয়েছিল জাতীয় আন্দোলনের বড় বড় নেতাকেও। অবিভক্ত বাংলার জলপাইগুড়ি জেলার পচাগড়, দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া এবং পাটগ্রামসহ মোট ৬৭২ বর্গমাইল এলাকা ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্টের পর অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা থেকে কেটে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। এই এলাকার অন্তর্গত বোদা, ময়নাদিঘি ইত্যাদি এলাকার ছোটবড় হাটগুলিতে জোতদার ও জমিদারদের খাজনা ও তোলা আদায়ের অত্যাচার বাড়ে। এই অত্যাচারী জোতদার এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে গ্রামের নিপীড়িত কৃষক, ভাগচাষি ও খেটে খাওয়া মানুষদের সংগঠিত করার দায়িত্ব নেন মাধব দত্ত, গুরুদাস রায়, নরেশ চক্রবর্তী, শচীন দাশগুপ্ত-সহ আরও অনেকে। এঁরা কৃষকদের সংগঠিত করে আওয়াজ তুললেন, 'লাঙল যার, জমি তার' এবং 'গান্ডি তোলা বন্ধ করো'। আন্দোলনের জোয়ার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। গান্ডি আদায় বন্ধের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ির কৃষক আন্দোলনের জয়যাত্রা সূচিত হয়। রংপুর এবং দিনাজপুরের কৃষক আন্দোলনও

জলপাইগুড়ির কৃষক আন্দোলন থেকে প্রেরণা লাভ করে। গোবিন্দ কুণ্ডু, অবনী তলাপাত্র, পানু মজুমদার, কল্যাণী দাশগুপ্ত, অমিয়া নন্দী প্রমুখ পরোক্ষভাবে তেভাগা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন।

১৯৩৯ সালে ময়নাদিঘিতে জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকসভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সদর, কেদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ থানায় কৃষকসভার সমিতি গঠিত হয়। সম্মেলনে কৃষকসভার পক্ষে বক্তব্য রাখেন আবদুল্লা রসুল এবং বঙ্কিম মুখার্জি। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকরা গান্ডি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের আন্দোলনের ভিত মজবুত করে। সুশিক্ষিত এবং সুদক্ষ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হয়। কৃষকসভার জোতদার ও জমিদার প্রথা ধ্বংস হোক— এই স্লোগান জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করে। কৃষক আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য বর্ধিষ্ণু জোতদার জমিদার এবং সেই সঙ্গে ক্ষত্রিয় সমিতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৪০-৪৬ পর্যন্ত গোটা জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগানগুলিতে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চা-বাগিচায় ঠিকা প্রথা উচ্ছেদ, মজুরি বৃদ্ধি, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং শ্রমিকদের কাজে স্থায়ীকরণের দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে। তবে কৃষক আন্দোলন কিন্তু থেমে থাকেনি। যদিও সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ কৃষক আন্দোলনের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল।

উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তার পূর্ব পাড় এবং পশ্চিম পাড়ের আধুনিক ইতিহাস আলাদা। ইংরেজ সরকারের দ্বারা ১৮৬৪-৬৫ সালে ডুয়ার্স অধিকারের সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত ডুয়ার্সের জনবিন্যাস যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তার তুলনা খুব বেশি পাওয়া যাবে না। ডুয়ার্সে কোন নৃগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বা কোন অঞ্চলে কোন জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ তা আজ স্পষ্ট। ডুয়ার্সের চা-বাগিচার আদিবাসী চা শ্রমিক নিয়ে গঠিত হয়েছে 'উত্তরবঙ্গাল ঝাড়খণ্ডী সংঘর্ষ সমিতি'। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায় লোকসভা এবং বিধানসভার আসন সংরক্ষণের নীতি থেকে। সাম্প্রতিক বিভাজিত বর্তমান আলিপুরদুয়ার জেলার একটি লোকসভা কেন্দ্রই তপশিলি আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত। জেলার ১২টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৫টি আসন আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত এবং সব ক'টিই ডুয়ার্সে। তপশিলি জাতিদের জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত হয়েছে। ডুয়ার্সের ভুটান সংলগ্ন জয়গাঁ জনপদের নেপালি ভাষাভাষী লোকসংখ্যা লাগামহীনভাবে বাড়ছে। জয়গাঁতে, মালবাজারে, মেটেলিতে, নাগরাকাটায় এই বিপুল সংখ্যক আদিবাসী বা নেপালি ভাষাভাষী মানুষ ১৯৭১ সালের জনগণনায় ছিল না। তাই প্রশ্ন উঠছে, ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার, জয়গাঁতে সেই হার বহু গুণ বেশি কেন? এভাবেই ডুয়ার্সের জনবিন্যাসের কাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে, আর তা থেকে জন্মাচ্ছে নতুন নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা দল, যারা ভারতবর্ষের নীতিনির্ধারকদের নরমপন্থী গণতান্ত্রিকতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে প্রকৃতিগতভাবে শান্ত ডুয়ার্সকে অশান্ত এবং অগ্নিগর্ভ করে তুলছে। তাই স্বাধীনতার ৭০ বছরের প্রেক্ষাপটে তখনকার ইতিহাসকে স্বাধীনোত্তর ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা এবং স্বাধীনতাকে নতুন করে ফিরে দেখার বাসনায় কিছু প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে সমীক্ষা করতে বেরিয়ে ভালয়-মন্দে মেশানো কিছু অভিজ্ঞতা হল। জলপাইগুড়ি এসি কলেজের ইতিহাস বিভাগের শতকরা ষাটজন ছাত্রের বেরুবাড়ি আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস জানা নেই। ডুয়ার্সের চা শ্রমিক সমস্যা সমাধানের পথ নিয়ে পি ডি উইমেন'স কলেজের ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকার কোনও দিক্‌নির্দেশ নেই। তাঁর মতে, সরকার এবং চা মালিকরাই শ্রমিকদের বিষয়গুলি বুঝে নেবে। ডুয়ার্সের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদী তাণ্ডবের প্রেক্ষিতে শিক্ষক-নেতা বিপ্লব ঝাঁ মনে করেন, তীব্র বেকার সমস্যা, পাইয়ে দেওয়া রাজনীতি, অসংগ্রামী মনোবৃত্তি, তীব্র হতাশা শ্রেণিসংগ্রামের প্রেক্ষাপট রচনা করছে। এই শ্রেণিকে সাংগঠনিকভাবে সচেতন করা যাচ্ছে না বলে এদের অনেকেই দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে এবং স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি ডুয়ার্সে সাম্প্রতিককালে অবাঙালিদের চাপে বাঙালিরা কোণঠাসা বলে মনে করেন ডুয়ার্স অভিভাবক মঞ্চের ল্যারি বোস। তাঁর মতে, আসামের 'বঙ্গালি খেদা আন্দোলন' পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতবর্ষীয় বাঙালি সমাজকে রূঢ় বাস্তবতার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ডুয়ার্সের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এবং গোষ্ঠীচেতনা সেই প্রকারেরই শ্রেণিদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে বলে তাঁর অভিমত।

নৃগোষ্ঠীগত রাজনৈতিক শ্রেণিদ্বন্দ্ব নিয়ে ব্যাপক চিন্তিত আনন্দগোপাল ঘোষ, উমেশ শর্মা প্রমুখ ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক এবং গবেষকবৃন্দ, উত্তরখণ্ড দল, কামতাপুর পিপল'স পার্টি, কামতাপুর ডেমোক্র্যাটিক

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি ডুয়ার্সে সাম্প্রতিককালে অবাঙালিদের চাপে বাঙালিরা কোণঠাসা বলে মনে করেন ডুয়ার্স অভিভাবক মঞ্চের ল্যারি বোস। তাঁর মতে, আসামের 'বঙ্গালি খেদা আন্দোলন' পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতবর্ষীয় বাঙালি সমাজকে রূঢ় বাস্তবতার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

ফ্রন্ট, গোর্খা লিগ, গজমুমু, আদিবাসী বিকাশ পরিষদ ভাষাগত, গোষ্ঠীগত, জাতিগত বিভাজনের পক্ষে বিবিধ দাবিদাওয়া পেশ করছে, যা সরকারের মান্যতা পাওয়ার অর্থই হচ্ছে অপর জাতি বা গোষ্ঠীর অভিমান বৃদ্ধি পাওয়া। এভাবেই ডুয়ার্সে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে বিচ্ছিন্নতাবাদ, যা আগামী দিনে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করবে। ফলে সরকারের উচিত ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যার ফলে বৈষম্য মাথাচাড়া দেবে না। বিপদ একটাই, আসামের বোড়োরা তাদের ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বোড়োল্যান্ডে জলপাইগুড়িকে শামিল করেছেন। দার্জিলিঙের অধিকাংশ নেপালি রাজনৈতিক দল জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের মালবাজার, নাগরাকাটা, কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্রগুলিকে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি তুলেছেন। অল কোচ-রাজবংশী স্টুডেন্টস' ইউনিয়ন তাদের প্রস্তাবিত কামতাপুর রাজ্যে জলপাইগুড়িকে যুক্ত করেছে। তাই স্বপ্নের ডুয়ার্স, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও সম্পদে ভরপুর ডুয়ার্সের এই অগ্নিগর্ভ চিত্র জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। স্বাধীনতার ৭০ বছর পূর্তিতে তাই কামতাপুরীদের আবার সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে ফিরে যাবার প্রবণতা, আইএসআই, আইসিস-দের নেতৃত্বে জঙ্গি সংগঠনগুলির যৌথ মানবতা বিঘ্নকারী নাশকতামূলক কর্মসূচি স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। তাই রাষ্ট্রযন্ত্র যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি তামাম ভারতবাসীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথনির্দেশ করতে না পারে তাহলে সমূহ ক্ষতি গণতন্ত্রেরই।

গৌতম চক্রবর্তী

এই স্বাধীনতা দিবসে মোদিজি কি আদৌ 'স্বাধীন' হবেন?

ক্ষমতায় আসার আগে নরেন্দ্রভাই দামোদর দাস মোদি মিডিয়ার কল্যাণে দুটো জিনিস সত্যি বলে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। প্রথমটা হল, দুর্নীতির অপর নাম কংগ্রেস এবং ইউপিএ সরকারের প্রকল্পগুলি আসলে দুর্নীতির আখড়া। কমবেশি চার গন্ডা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বোঝাতে পেরেছিলেন যে, তিনিই পারেন দেশকে কংগ্রেসমুক্ত করে উন্নতির চুড়োয় পৌঁছে দিতে। কারণ, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি সে রাজ্যকে করে তুলেছেন 'উন্নতির মডেল'। মিডিয়ার কেউ কেউ আদা-জল খেয়ে গুজরাতকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য গোয়েবেলসের কায়দা ধার করেছিলেন।

কংগ্রেসমুক্ত ভারত গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার গঠনের ১৮০ দিনের মাথায় দেখা গেল, মোদিজি আসলে ইউপিএ সরকারের যেসব কাজকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী হয়ে সেসবই আঁকড়ে ধরেছেন। এই ডিগবাজিকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয় 'ইউ-টার্ন'। কংগ্রেসের অভিযোগ থেকে জানা গেল—

কালো টাকা

কালো টাকা বাবদ একটি পয়সাও বিজেপি সরকার ফিরিয়ে আনতে পারেনি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সরকার যে নামের তালিকা জমা দিয়েছে, সে তালিকা ইউপিএ সরকারের করা তালিকা। এখন সবাই বুঝতে পেরেছে যে, কালো টাকা উদ্ধারে কংগ্রেস বাস্তব পথেই এগচ্ছিল।

কী বলেছিলেন মোদিজি ও তাঁর দল?

১৭ এপ্রিল ২০১৪-তে রাজনাথ সিং বলেছিলেন, ক্ষমতায় আসার ১০০ দিনের মধ্যে কালো টাকা ফিরিয়ে আনবেন। ভোটের প্রচারে মোদি বললেন, টাকা ফিরিয়ে আনলে দেশের নাগরিকদের অ্যাকাউন্টে মাথাপিছু ১৫ লক্ষ টাকা জমা করে দেবেন (যদিও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর রেডিয়োতে 'মন কি বাত' নামে একটি অনুষ্ঠানে স্বীকার করলেন যে, কালো টাকার পরিমাণ তিনি আদৌ জানেনই না!)। মজার কথা, ১৮-০১-২০১১-তে নীতিন গড়করি দাবি করেছিলেন যে, সুইস ব্যাঙ্কে জমে থাকা কালো টাকার পরিমাণ ২১ লক্ষ হাজার কোটি টাকা! মোদিজি ও তাঁর দল বারবার একটা কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে এসেছেন। সেটা হল এই যে, কংগ্রেস ইচ্ছে করে কালো টাকা ফিরিয়ে আনছে না। নামধামও প্রকাশ করছে না। তারা ক্ষমতায় এলেই রহস্য ফাঁস হবে।

ক্ষমতায় এসে শুরু হল বিজেপি ও মোদিজির উলটো সুরের গান।

১৭-১০-২০১৪-তে মোদিজি আদালতে এফিডেভিট করে জানালেন যে, কালো টাকার মালিকদের নামধাম প্রকাশ করা অসম্ভব। 'Double taxation avoidance agreement'-এর কারণে এটা সম্ভব নয়। একই কারণে ইউপিএ সরকারও যে নামগুলি প্রকাশ্যে আনতে পারছিল না, সেটা বিজেপি আগে মানেনি। আরেক বিজেপি নেতা রবিশংকর প্রসাদ বলেছিলেন, ডাবল ট্যাক্সেশন হল ফালতু ব্যাপার (১৮-০১-২০১১)। তখন যা ফালতু ছিল, এখন তা মেনে নেওয়ার কারণ কী?

১৭-১০-২০১৪-তে আবার এফিডেভিট করে মোদিজি বললেন, কালো টাকার মালিকদের নাম প্রকাশ্যে আনলে তা International Standards on Maintaining Confidentiality-র বিরুদ্ধে যাবে। এতে ভারতের রেটিং কমে যাবে। এই বাধ্যবাধকতার কারণে তিনি কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন, এবার নিজেও সেটাই মানলেন। এই এফিডেভিটের উত্তরে সুপ্রিম কোর্ট জানতে চাইলেন, কেন মোদির সরকার কালো টাকার মালিকদের মাথায় ছাতা ধরতে চাইছে? বিজেপি নির্লজ্জের মতো চুপ থাকল।

এর পর বিজেপি কয়েকটা নাম প্রকাশ করে আবার চেপে গেল। সুপ্রিম কোর্ট ক্ষিপ্ত হয়ে নির্দেশ দিলেন যে, মোদি সরকার যেন নামগুলির তালিকা আগে সম্পূর্ণ করে। মোদিজি কংগ্রেসের তৈরি করা তালিকাটি জমা দিয়ে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন।

এর পর আরও অনেক জল বয়ে গিয়েছে দেশের নদীগুলি দিয়ে। কিন্তু এখনও কালো টাকা দিয়ে মোদিজি যা করেছেন তা ইউপিএ জমানার চাইতে বেশি কিছু নয়।

আধার কার্ড

মানুষের হাতে সরকারি প্রকল্প ও ভরতুকির কারণে প্রাপ্য টাকা সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইউপিএ সরকার যে নীতি নিয়েছিল,

তার ফলে আধার কার্ডের কথা ভাবা হয়। এটা বিশ্বের বৃহত্তম বায়োমেট্রিক প্রকল্প। তখন বিজেপি তো কমিউনিস্টদের থেকে 'বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা' নীতি নিয়ে আসরে নেমেছিল। সুতরাং আধার কার্ডের বিরুদ্ধে তাঁদের হুংকার শোনা গেল।

২৮ নভেম্বর ২০১২ বিজেপি'র প্রকাশ জাভেদকর বললেন, 'ক্যাশ ট্রান্সফার দিয়ে খেলা বদলানো যাবে না। এ দিয়ে গরিবের সঙ্গে নতুন খেলা শুরু হচ্ছে। এটা (আধার) কংগ্রেস স্রেফ রাজনৈতিক কারণে মূল্যবৃদ্ধি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নির্বাচনে জেতার জন্য আনছে।'

৮ এপ্রিল ২০১৪-তে কর্ণাটকে এক নির্বাচনী প্রচারে মোদিজি হুংকারে আরও নাটকীয়তা এনে বলে ফেললেন যে, ইউপিএ'র আধার প্রকল্প ব্যর্থ। আর ব্যাপারটাই ছিল দুর্নীতির অঙ্গ। মুখপাত্র প্রকাশ জাভেদকর অবশ্য ২ এপ্রিলেই বলে দিয়েছিলেন, আধার কার্ড দিয়ে কিস্‌সু হবে না। আমরা চাইছি সিটিজেনশিপ কার্ড। আধার কার্ড দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের বৈধতা দেওয়াই ইউপিএ-র উদ্দেশ্য।

তারপর বিজেপি ক্ষমতায় এল। এখন অবশ্য 'আমি বাংলাদেশি' বললেই নাগরিকত্ব পাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। তা ক্ষমতায় আসার পর দেখা গেল যে—

ক) গ্যাসের ভরতুকি সরাসরি অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আধার কার্ডের প্রয়োজন হল। এতে সরকারের ২, ০০০ কোটির বেশি সাশ্রয় হবে। ব্যাপারটা বিজেপি কমিউনিস্টদের মতোই ইচ্ছে করে দেরিতে বুঝল। অনেকের মতে, 'এটাই অন্যতম সেরা ডিগবাজি।' ইউপিএ'র 'কালো' তাদের আমলে 'ভাল'।

খ) ২২-১০-২০১৪-তে অরুণ জেটলি 'বুদ্ধর মুখে মমতার নাম'-এর মতো বললেন যে, আধার কার্ড একটা যুক্তিসম্মত ভাবনা। এটার উপর কোনও একটা দলের স্বত্ব থাকতে পারে না।

অবশেষে, ওই বছরের নভেম্বরে বিজেপি সরকার জানিয়ে দিল যে, যেহেতু আধার কার্ড বায়োমেট্রিক ভিত্তিতে বানানো হবে, তাই এটা দিয়ে জুয়া-জোচ্চুরি করা সম্ভব নয়। মুক্ত নয়, মোদিজি আরও একবার 'কংগ্রেসযুক্ত' হলেন।

চিন দিয়ে চিনে নিন মোদিজির প্রতিভা

২০১৩ সালের ১১ অগাস্ট, হায়দরাবাদে একটি নির্বাচনী সভায় মোদিজি বলেছিলেন, 'চিন আমাদের সীমান্তে গোলমাল করছে অথচ সরকার (ইউপিএ) তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য চাপ না দিয়ে আলোচনা আর চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যস্ত।' তৎকালীন বিদেশ মন্ত্রী সলমন খুরশিদকে তীব্র ভাষায় বলেছিলেন, 'লজ্জার কথা! আপনি ১২৫ কোটি ভারতবাসীর ক্ষতে লবণ দিয়েছেন!'

মোদিজি উক্ত দিনে টুইট করলেন, 'India is going through a troubled situation. China intrudes our border.'

এর পর চিনের রাষ্ট্রপতি জি পিং ভারত সফরে এলেন। মোদিজি প্রধানমন্ত্রী। জি পিং-এর সফরের কালে ১০০০ চিনা সৈন্য ১৬ দিন ভারতের সীমানায় ঢুকে চুমারে বসে রইল। এটা আগে কখনও হয়নি। প্রতিবেশীর সেনা আমাদের দেশে ঢুকে আমাদের এলাকা দখল করে বসে আছে, আর তাদের

২০১৩ সালের ১১ অগাস্ট, হায়দরাবাদে একটি নির্বাচনী সভায় মোদিজি বলেছিলেন, 'চিন আমাদের সীমান্তে গোলমাল করছে অথচ সরকার (ইউপিএ) তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য চাপ না দিয়ে আলোচনা আর চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যস্ত।' তৎকালীন বিদেশ মন্ত্রী সলমন খুরশিদকে তীব্র ভাষায় বলেছিলেন, 'লজ্জার কথা! আপনি ১২৫ কোটি ভারতবাসীর ক্ষতে লবণ দিয়েছেন!'

রাষ্ট্রপতিকে মোদিজির সরকার স্বাগত জানাচ্ছে! ২২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে রাজনাথ সিং এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন, 'Perception difference.' অর্থাৎ 'লাইন অব কনট্রোল' নিয়ে ভারতের ধারণা আর চিনের ধারণার পার্থক্য থাকার কারণেই চিনা সৈন্য নাকি চুমার দখল করে ১৬ দিন বসে ছিল। এমন হাস্যকর যুক্তি টিভি চ্যানেলের কমেডি শো-গুলোতে অনুষ্ঠানে মানায়। আমরা কি মোদিজিকে 'ডিগবাজিগর' উপাধি দিতে পারি?

ওই সময় অবধি কাশ্মীর এবং পাকিস্তান বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ঠিক কী করবেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু তখন সরকারের বয়স ১৮০ দিন। আর এখন ৭২০ দিন পার। আসন্ন স্বাধীনতা দিবসে 'জাদুকরী বক্তৃতা'য় তিনি কি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কোনও 'বাস্তব' বাণী শোনাতে পারবেন, যা ইউপিএ'র তুলনায়ও অভিনব? সম্ভব নয়। বড়জোর হুংকার মেশানো, বীররসাত্মক, আবেগের সুস্বাদু সিরাপ মেশানো কিছু বলবেন। বলতে পারেন যে, পাকিস্তান কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করতে চায়। এটা কোনও অভিনব উপলব্ধির পরিচয় না হলেও আপাতত কাজ চলে যেতে পারে। কিন্তু কাশ্মীরে সত্যিই কী হচ্ছে? মণিপুরের দৃষ্টান্ত থেকে জানি যে, দেশের সব মানুষ সেনাকে 'নেতাজি'র চোখে দেখে না। কাশ্মীরেও এমন মানুষ অনেক। এরা কি সবাই বিচ্ছিন্নতাবাদী? কিন্তু এই জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করামাত্রই বিজেপি'র পক্ষ থেকে যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার পরিবর্তে 'দেশদ্রোহী' তকমা লাগিয়ে অভিযোগগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে বিজেপি 'দেশদ্রোহী' আখ্যায় ভূষিত যত করবে, প্রশ্ন উঠবে তত।

আর চিন কিন্তু ভারতের বিরোধিতা এই সে দিন পর্যন্ত করে গেল একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়ে। এখন তো অরুণাচলের দিকে রাশি রাশি সেনা জড়ো করার প্ল্যান। বোঝাই যাচ্ছে, রাজনাথ কথিত 'Perception difference' আদৌ ঘোচেনি। কেবল বক্তৃতা আর দেশভ্রমণে এসব মেটে না। এ হল কঠোর কঠিন বাস্তব।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। আসলে কংগ্রেসমুক্ত ভারত গড়তে গিয়ে মোদিজি নিজেই কংগ্রেসমুক্ত হতে পারছেন না। তাঁর সরকারের দু'বছর পেরিয়েছে। এই মুহূর্তে তাঁকে যেনতেন প্রকারে গান্ধি পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। কারণ বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ রাহুর দশায় পৌঁছেছে। কর্মসংস্থানের ব্যাপারে শোচনীয় পারফর্মেন্স তাঁর সরকারের। বলা হচ্ছে যে, মোদিজির বক্তৃতা অসাধারণ, কিন্তু মনমোহন সিংহর নাটকীয়তা বর্জিত ম্রিয়মাণ ভাষণের গভীরতা অনেক বেশি ছিল।

গান্ধি পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণ না করতে পারলে মোদিজির হাতে একটাই তাস থাকবে। অতিপরিচিত হিন্দুত্ব তাসের টেক্কা। কারণ এই তাসটাই তাঁকে কংগ্রেসমুক্ত হতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সেখানেও ঠিক খাপ খুলতে পারছেন না। হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত মামলায় সোনিয়া গান্ধির নাম বিচারক তাঁর রায়ে চারবার উল্লেখ করেছিলেন বলে একদিন সন্ধ্যায় বিজেপি'কে মহা উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। কিন্তু অচিরেই জানা গেল, চারবার সোনিয়া গান্ধির নাম এসেছিল চারটে ফ্যাক্স করা তালিকার সূত্রে। চারটেই ছিল সেইসব ভিভিআইপি'র নামের তালিকা, যাঁরা হেলিকপ্টার ব্যবহার করেন এই দেশে। ফলে বেলুন গেল চুপসে।

এই অবস্থায় যাঁরা 'কংগ্রেসমুক্ত ভারত' গঠনের স্বপ্ন দেখছিলেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই

> দেশের জাতীয় পতাকায় গেরুয়ার স্থান যতটা, সাদা আর সবুজেরও ঠিক ততটাই। সাদা-সবুজের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ার মতো কোনও পরিকল্পনা কি শোনাবেন না আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যিনি একদা সামান্য চা বিক্রেতা ছিলেন এবং যে চা বিক্রির কোনও তথ্যই নেই সরকারের কাছে? একটা যথার্থ 'কংগ্রেসমুক্ত' ভাবনার কথা? যা থেকে আমরা ভাবতেই পারি, 'অচ্ছে দিন' দরজায় টোকা দিচ্ছে!

ভাবতে শুরু করেছেন, তা-ই তো! মোদিজির ভারত কই? এ তো ঘুরে-ফিরে সেই মনমোহন সিং। তবে একজন খুব কম বলতেন। 'কথা কম, কাজ বেশি' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু মোদিজি কেবল বলছেন আর বলছেন। শুকনো কথায় চিঁড়ে ক'দিন ভিজবে? গত দু'বছরে দিনগুলি, রাতগুলি 'অচ্ছে' হওয়ার প্রমাণও মিলছে না। দিল্লির অমলারা প্রায় প্রকাশ্যেই ইদানীং ঠাট্টার সুরে বলছেন, দেশের অবস্থা কীরকম জানতে চাইছেন? দেখছেন না মোদিজির সব চুল কেমন এত তাড়াতাড়ি সাদা হয়ে গেল! তাঁদের মতে, মোদির ভরসা এখন মিডিয়ার একাংশ। মিডিয়ার সেই অংশটি এখন প্রকাশ্যে 'দেশাত্মবোধ' বিক্রি করছে। আর যাঁরাই কাগজে বা টিভিতে কাশ্মীর প্রশ্নে মোদি সরকারকে তুলোধোনা করছেন, তাঁদের 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিচ্ছে। যদিও মোদি সাহেব ভাল করেই জানেন, মিডিয়া জনমত গড়তে সাহায্য করে, কিন্তু তা বদলেও দিতে পারে। মানুষের আশা-ভরসায় যখন আঘাত লাগে, তখন তার সঙ্গে যদি সঠিক বিরোধী নেতৃত্বের হদিশ পায়, তখন তা দেখতে দেখতে কয়েকদিনেই ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। সঠিক নেতৃত্বের দিশা দেখাতে না পারলে কংগ্রেস কমজোরি হয়ে থাকবে আরও কিছুদিন, গান্ধি পরিবারকে আরও নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারলে কংগ্রেসে ভাঙন ধরানো হয়ত সম্ভব— এখন সম্ভবত সেইসব ভরসাতেই থাকেন নরেন্দ্রভাই। কিন্তু সবে তো মাঝদরিয়ায়, উনিশে পৌঁছাতে এখনও তিন বছর, মানুষের ধৈর্য ততদিন টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে তো!

এ বছর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে লালকেল্লায় মোদিজি নির্ঘাত আরও একটি নাটকীয় ভাষণ দেবেন। যেমন সিনেমা-থিয়েটারে দেখা যায়। কিন্তু সেই ভাষণে মোদিজির নিজস্ব কিছু থাকবে? যথার্থ 'কংগ্রেসমুক্ত' প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারবেন কি নিজেকে? একটা কংগ্রেসমুক্ত নীতি তিনি নিতে পেরেছেন সম্প্রতি। তা হল, পোস্টাপিসের মাধ্যমে গঙ্গাজল বিক্রি। সন্দেহ নেই, এই ধরনের মৌলিক নীতি কংগ্রেসের পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

দেশের বড় অংশে রোজকার 'অড়হর ডাল' ১৬০ টাকা/কেজি। চিনি চল্লিশোর্ধ্ব। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন 'পে কমিশন' পরামর্শে যতটা বাড়ল তা স্বাধীনতার পর সর্বনিম্ন। গান্ধি পরিবারকে পেড়ে ফেলতে না পারলে লোককে স্তোকবাক্য দিয়ে বোঝানো কঠিন হবে আরও। পাকিস্তানের সঙ্গে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব তৈরি হলে অবশ্য পরিস্থিতি মন্দ হয় না। অথচ প্রতিশ্রুতির 'অচ্ছে দিন' বাস্তবায়িত করার জন্য আশা ছিল, মোদিজি কিছু স্বতন্ত্র পথের নির্দেশ দেবেন, যা কংগ্রেস বা তার দ্বারা পরিচালিত জোট সরকার দিতে ব্যর্থ হয়েছিল এতদিন। বদলে, কে গোরুর মাংস খাচ্ছে না খাচ্ছে, তা-ই নিয়ে ভাবনাচিন্তার আদৌ কোনও দরকার ছিল বলে মনে হয় না।

কিন্তু এই নীতিই চোখে আঙুল দিয়ে প্রশ্ন জাগায়, পারবেন কি তাঁর নীতিনির্ধারক আরএসএস-এর বজ্রমুষ্টি থেকে নিজেকে খানিক আলগা করে মুক্তির শ্বাস নিতে?

দেশের জাতীয় পতাকায় গেরুয়ার স্থান যতটা, সাদা আর সবুজেরও ঠিক ততটাই। সাদা-সবুজের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ার মতো কোনও পরিকল্পনা কি শোনাবেন না আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যিনি একদা সামান্য চা বিক্রেতা ছিলেন এবং যে চা বিক্রির কোনও তথ্যই নেই সরকারের কাছে? একটা যথার্থ 'কংগ্রেসমুক্ত' ভাবনার কথা? যা থেকে আমরা ভাবতেই পারি, 'অচ্ছে দিন' দরজায় টোকা দিচ্ছে! ক্ষমতায় আসার ছ'মাসের মধ্যে মোদিজির ইউ-টার্ন নেওয়ার দক্ষতা দেখে কংগ্রেস সেসব নিয়ে এখন আর কিছুই বলছে না। কিন্তু 'কংগ্রেসমুক্ত' ভারতের কথা শুনে মিটিমিটি হাসছে। এই স্বাধীনতা দিবসে মোদিজি কি 'স্বাধীন' হবেন? মুক্ত হবেন? নতুন পথ দেখাবেন?

শুনে কে জানি বললেন, গোড়ায় গলদ। এখন যাকে 'মোদি কোট' বলা হয়, সেটা তো আগে 'জহর কোট' ছিল। তুলনায় রামদেববাবা অনেক বেশি কংগ্রেসমুক্ত মানুষ।

রাজনীতি বড়ই কূট বৎস। 'কূট' মানে 'জটিল'।

সোমপ্রিয় বণিক

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

১

'গড অব স্মল থিংস' বলে একখানা কেতাবের কথা জানলেও সে দিন পটলরাম পর্যটক হোয়াটসঅ্যাপে জানাল যে, সে দুর্ধর্ষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে 'গড অব কমপ্লেক্স' নামক একটি কেতাব নামাতে চলেছে, যার নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কী নিয়ে লেখা।
সেটা কী?

২

'হিম হয়ে যায় হিমোগ্লোবিন' নামক উত্তরাধুনিক রবীন্দ্র-আলোচনা পড়ে আমি পটলরামকে বললাম, 'আহা! কী রচনা!' কিন্তু পটলরামের মতে ওটা কোনও লেখাই নয়। তার ঠাকুরদার মাসতুতো ভাই শরমোহন বিশুদ্ধবাগীশ সেই কবে ডুয়ার্সে এই ধরনের রচনা লিখেছিলেন, তার নাম 'টু অ্যান্ড স্টার অ্যান্ড আ'। নামেই বোঝা যায় কী নিয়ে লেখা। ছাপা হলে ডাবল নোবেল নিশ্চিত ছিল। পটল বলল বটে। কিন্তু কী নিয়ে লিখেছিলেন তার ঠাকুরদার ভাই? দু'টি তারকার ফিউশন?

৩

রাধার মাঝে মশা
বুদ্ধিতে দাও ঘষা
কোথায় এমন দশা?

গতবারের উত্তর— ১) নকশালবাড়ি ২) মেচেনি ৩) সিতাই

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

ডুয়ার্সের নদীনাম

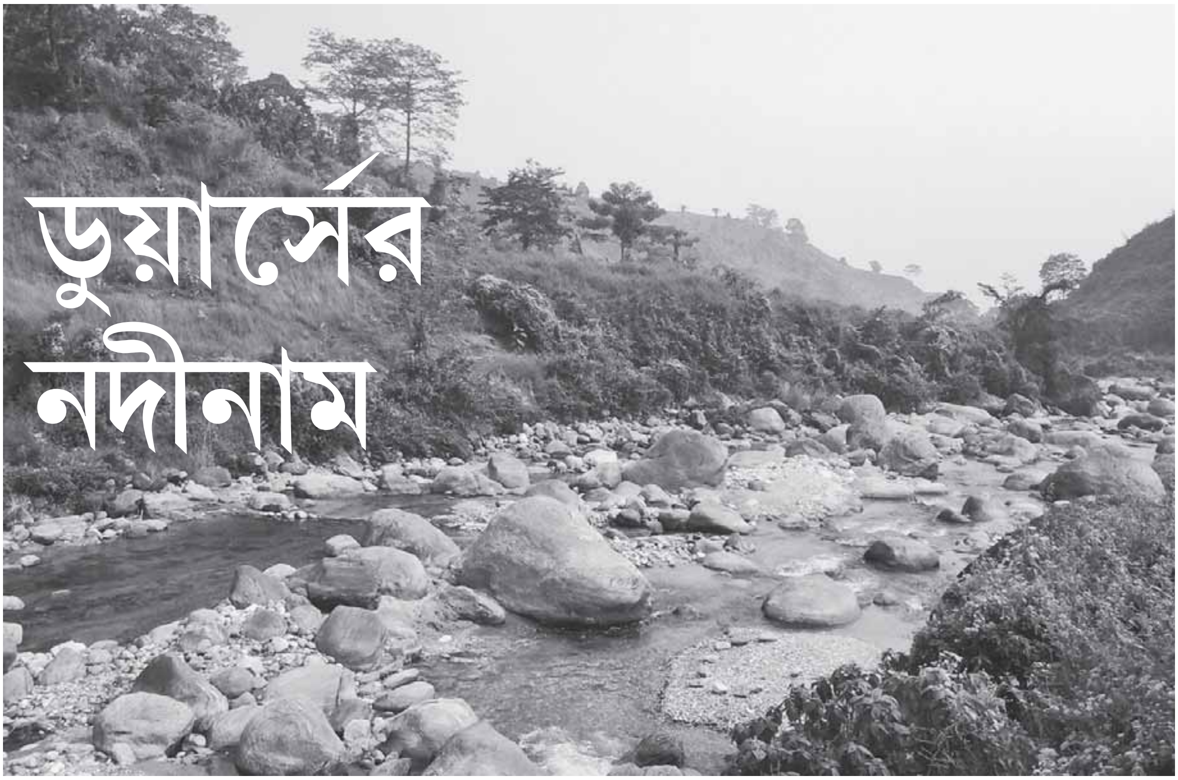

ডুয়ার্সে নদীর সংখ্যা ৭৫। ছোট নদীগুলির গভীরতা নেই বললেই চলে। নদী-বুক জুড়ে বিছানো নুড়িপাথর। বর্ষায় এই নদীগুলিই আবার পর্যটনে ইতি টানে। মাদারিহাটের টোটোপাড়ায় অথবা কালচিনির ডুকপা জনজাতির গাঁয়ে যেতে তখন একাধিক নদী পেরতে হয়। বছরের অন্য সময়ে যদিও পর্যটনের জিপগুলো ডিমা, পারো, বালা নদীর উপর দিয়ে দু'দিকে জল ছিটিয়ে অনায়াসে পেরিয়ে যায়।

ভূতাত্ত্বিক কারণে এবং প্রবল বন্যায় ডুয়ার্সের নদীগুলি ক্রমে পুব দিকে সরে যায়। ডুয়ার্স জুড়ে অজস্র পরিত্যক্ত নদীখাত নদীর প্রবাহপথ সঞ্চরণের প্রমাণ। তোর্সা, কালজানি, আলাইকুরি, গরম, রায়ডাক প্রভৃতি নদী এমনই বারে বারে তাদের নিজস্ব গতিপথ ছেড়ে অভিমুখ বদলেছে। প্রবাহপথ ছেড়ে আসা তোর্সা নদী বর্তমানে চার-চারটে পরিত্যক্ত পৃথক নামে পরিচিত— মরা তোর্সা, চর তোর্সা, বুড়ি তোর্সা ও শিল তোর্সা।

ডুয়ার্সে নদীর পরিত্যক্ত প্রবাহপথের খাতের সংস্কারে নদীর নাম বদলে যেতে দেখা যায়। যেমন, বসরা নদীর পরিত্যক্ত খাত কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ সংস্কার করিয়ে নলরাজার গড়ের অভিমুখে জলপ্রবাহ ঘটিয়েছিলেন। বানানো নদী, তাই বসরার পরিত্যক্ত খাতের নাম হয়ে যায় বানিয়া। ডুয়ার্সের এই ধরনের পরিত্যক্ত নদীখাত স্থানে স্থানে দহ বা জলাশয় সৃষ্টি করেছে। এই জলাভূমিগুলি ডারা, ছড়া, কুড়া প্রভৃতি নামে পরিচিত।

ডুয়ার্সের ৭৫টি নদী নামের শেষাংশে 'তি' কথাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসেছে। বোড়ো শব্দ 'তি'-র অর্থ জল। তিতি, রেতি, জিতি, জয়ন্তি, কুরাতি, মূর্তি, বউটি, কুলটি, একটি, বিরবিটি, চৈতি, বংতি, গিলান্তি— এমনই অসংখ্য তি-যুক্ত নদীনাম, ডুয়ার্সের প্রধান নদী তিস্তাও তি-যুক্ত। দেবদেবীর নামে একটি নদীনাম (গদাধর) থাকলেও ব্যক্তিনামে একটিও নদীনাম দেখা যায় না। ডুয়ার্সের নদীনালা ভূবৈচিত্রের শৈলীতে বারে বারে স্থান করে নিয়েছে। ভূমিরূপ ও ভৌগোলিক উপাদান ডুয়ার্সের নদীর নামকরণে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

ভূতাত্ত্বিক কারণে এবং প্রবল বন্যায় ডুয়ার্সের নদীগুলি ক্রমে পুব দিকে সরে যায়। ডুয়ার্স জুড়ে অজস্র পরিত্যক্ত নদীখাত নদীর প্রবাহপথ সঞ্চরণের প্রমাণ। তোর্সা, কালজানি, আলাইকুরি, গরম, রায়ডাক প্রভৃতি নদী এমনই বারে বারে তাদের নিজস্ব গতিপথ ছেড়ে অভিমুখ বদলেছে।

ডুয়ার্সের নদীনামের সম্ভাব্য অর্থ

আলাইকুরি— আলাই-আর নাই? কুরি < কুংরি < কুমারী। কোচ রাজবংশের এক কুমারী রাজকন্যের নদীজলে ডুবে আত্মাহুতির কারণে লোকমুখে নদীর নাম প্রচলিত হয়ে যায় আলাইকুরি।

আংরাভাসা— আংরা = অঙ্গার, কয়লা। যে নদীর জলে অঙ্গার ভেসে যেতে দেখা যায়।

ইচা— চিংড়ি। যে নদীতে চিংড়ির সন্ধান মেলে।

একটি— এক + তি (জল, বোড়ো)। একই জলে প্রবাহিত, অন্য কোনও নদীর সঙ্গে মেশেনি।

এর < এড় (= পড়িত্যক্ত)। পরিত্যক্ত এলাকা দিয়ে প্রবাহিতা নদী।

কালকূট— প্রবাহপথের শেষে (কাল) যে নদীর পাড়ে দুর্গ (কূট) আছে।

কুংরি < কুমারী। কুমারী রাজকন্যের আত্মহননের ঘটনা যেখানে ঘটে।

কোড়দা— কোড়া = পানকৌড়ি। দা = দহ। যে নদীর গভীর স্থানে পানকৌড়ি দেখা যায়।

কুরতি < কুরা (রাজবংশী) = নদীর গভীর স্থান। তি = জল। যে নদীর গভীর স্থান দিয়ে জলপ্রবাহ ঘটে।
কুলটি— কুলটিকর। যে নদীর পাড় জুড়ে উঁচু ভূমিখণ্ড।
কালজানি— জানি = স্রোত। কাল = শেষ। ডিমা ও আলাইকুরি নদীদ্বয়ের সম্মিলনে বহতা স্রোত। কালস্রোত।
করলা < করালা (= ভীষণ, তুঙ্গ)। যখন-তখন ভীষণ মূর্তি ধারণ করে যে নদী।
করতোয়া— তোয়া = জল। আঁজলা ভরা জলে ভক্তি নিবেদনের নদী।
কুলকুলি— কলকল্লোলিনী কলতানে প্রবাহিতা নদী।
খোলানি— উন্মুক্ত, আবদ্ধ নদী।
গোলানি— রায়ডাকের পরিত্যক্ত প্রবাহপথে সৃষ্ট নদী। প্রবাহ গুলিয়ে গিয়ে গোলানি।
গিলান্দি— গ্রাস। বনবাদাড়, খেত গ্রাস করে যে নদী প্রবাহিত হয়।
গরম— গর্বিতা (?)। প্রবাহী স্রোতে সে এক গরবিনি নদী।
গদাধর— দেবনাম। গদাধর মন্দিরের গদাধরের নামে নদীর নাম।
ঘিস— দ্রুত। সবেগে যে নদী বয়।
ঘরঘরিয়া— সার দিয়ে ঘরবাড়ি যে নদীর পাড়ে দেখা যায়।
চুকচুকা < চকচকা? পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ জলপ্রবাহী নদী।
চেকো— বেড়া। অধিকৃত নদীর প্রবাহপথ।
চেল— বস্ত্র, শাড়ি। নদী যখন শাড়ির মতন।
চৈতি— যে নদীতে চৈত্র মাসেও জল (তি) থাকে।
জরধা < জটধা < জটদা। দহ থেকে জন্মে যে নদী ঝোপঝাড়ের জটাজালের মধ্য দিয়ে এগয়।
জয়ন্তি < জিয়ন + তি। সর্বদা জলপ্রবাহের জীবন্ত নদী। তি = জল।
জিতি < জি (= জিয়ন)। অনর্গল অনবরত প্রবাহী নদী।
জলঢাকা— বছরভর জলে পূর্ণ নদী। জলে ঢাকা (আবৃত) নদী।
জেল < জিল = কাঁকর। যে নদীর বুক ভরতি কাঁকর।
ঝিমিলা— কি মরিলা। ঝি = কন্যা। যে নদীর জলে জনৈকা কন্যার ডুবে মরার ঘটনা ঘটে।
জোড়াই— অন্য নদীর পরিত্যক্ত প্রবাহপথে জুড়ে গিয়ে নদীর নাম জোড়াই।
ডাবডুব— ডুব < ডুবা (= বন্যায় ডুবে যায় এমন জমি)। যে নদীর জলে বন্যা দেখা দেয়।
ডায়ানা— ইংরেজি নাম। রোমানদের শিকার, মৃগয়া, আলো ও যৌবনের দেবীর নাম ডায়ানা। মৃগ কাহিনি, ডায়ানা চিরকুমারী ও প্রিয়দর্শিনী।
ডিমডিমা— ডিম্বাকার প্রবাহপথের আকারযুক্ত নদী।
ডুডুয়া < টুডুয়া (= লুকোচুরি)। আঁকাবাঁকা প্রবাহী নদী।
ডিমা— ডিম্বাকার যে নদীর প্রবাহপথ।
তিস্তা— তিস্রোতা। লোকদেবতা 'তিস্তাবুড়ি'র নামে নদীনাম।
তোর্সা < তয়োরোষা (= ক্ষুব্ধ জলরাশি)। পৌরাণিক সময়ে নবতোয় নদী নামে পরিচিত। পাহাড়ে তোর্সার ডাকনাম অ্যাসো।
তুরতুরি < কুতকুরি = কুমারী তরুণী। কুমারী তরুণীর মতো উচ্ছল নদী।
তিস < তিষা। পিপাসা। যে নদীর জলে পিপাসা মেটে।
তিতি < তি = জল (বোড়ো)। বছরভর জলে পূর্ণ ক্ষুদ্রকায় নদী।
তুনবুনিয়া— যে নদীর পাড়ে তুন (ঘাস)-এর বন।
ধওলাঝোরা— ধওলা = স্বচ্ছ। ঝোরা = ঝরনা। স্বচ্ছ জলস্রোতে প্রবাহী নদী।
ধরলা < ধওলা। পরিষ্কার জলে পূর্ণ নদী।
ধার্সি < ধারারাশি। কয়েকটি স্রোতস্বিনীর সম্মিলিত ধারায় সৃষ্ট নদী।
নিন < নিদ্রা > নিন্দ > নিন। ঘুম। স্রোতহীন মজা (ঝিমিয়ে পড়া) নদী।
নোনাই < ন্যানদোই (= ছোট)। ছোট নদী।
নেওয়া < ন্যাংড়া। খোঁড়া— খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যে নদী বয়ে চলে।
পাগলি— মত্ত, অস্থির, উন্মত্ত। দামাল নদী।
পাঙ্গা— পাড়াগাঁ? পাড়াগাঁয়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নদী।
পানা— শৈবালদাম ভরতি স্রোতহীন নদী।
পারো < পারাবত (= পায়রা)। আদুরে নদী (পায়রার মতো)।
বিরবিটি— বিটি = মেয়ে। লজ্জাবতী কন্যার মতো যে নদী বেড় দিয়ে চলে।
বউটি < বউতি। তি = জল। যেখানে নদী থেকে বউয়ের জল আনার ঘটনা ঘটে।
বালা < বালুকা, বালি। বুক ভরতি বালুকার নদী।
বংতি < বন + তি। বনের ভিতর দিয়ে প্রবাহী জলস্রোতের নদী।
বসরা < বজরা? যে নদীতে বজরা ভাসে।
বানিয়া— বসরা নদীর এক পরিত্যক্ত খাতে বানানো নদীর নাম বানিয়া।
ভালুঝোরা— ঝরনা (ঝোরা) থেকে উৎপন্ন যে নদীর আশপাশে ভালুক ঘোরে।
সুজনাই— যেখানে মুজ ঘাস (দড়ি হয়) নাই।
মূর্তি < মুরতি। তি = জল। যে নদীতে সর্বদা জল থাকে। সৌম্য, শান্ত নদী।
মাল— উঁচু সরস ভূমি থেকে প্রবাহিতা নদী।
মানসাই < মানসারি? যে নদীর পাড়ে সারি সারি মান গাছ।
রেতি সুকৃতি— সুকৃতি = সৎ কর্ম। শুভ, সৌভাগ্য। তি = জল। যে নদীর জলস্পর্শে সৌভাগ্য সূচিত হয়। শুভকর্ম সম্পন্নের নদী।
লেপচা (রে)-দের ব্যবহৃত জলের (তি) নদী।
শিঙিমারি— যে নদীতে শিঙি মাছ ধরা পড়ে।
সানিয়াজান < সানু = পর্বতের উপরিস্থ সমতলভূমি। জান = স্রোত। পর্বতের উপরের সমতলভূমি থেকে যে নদীর পাড়ে পান্থশালা আছে।
সাংসারা < স্যারস্যারা (রাজবংশী), প্রায় নিঃশেষিত। যে নদীর গতিপথ প্রায় স্রোতহীন।
সাঞ্জিয়া— সাঁঝ। গাছগাছালিতে ঢাকা আবছা আধো ছায়ার নদী।
সংকোশ < সংকাশ, সকাশ, সমীপ। পল্লি সমীপে বহতা নদী।
হলং— হ + লং (= হইলাম)। নালা থেকে নদীতে রূপান্তরিত, তাই হলং।
হাঁসমারা— যে নদীতে হাঁস মারা পড়ার ঘটনা ঘটে।
হাউড়ি < হাওড়ি < হাওর। হাওর থেকে যে নদীর চলার পথ শুরু হয়েছে।
রায়ডাক— কোচ রাজ্যের রায়কতদের (রায়) ইজারা নেওয়া (ডাক) স্থানের মধ্য দিয়ে বহতা নদী।

গৌতমকুমার দাস

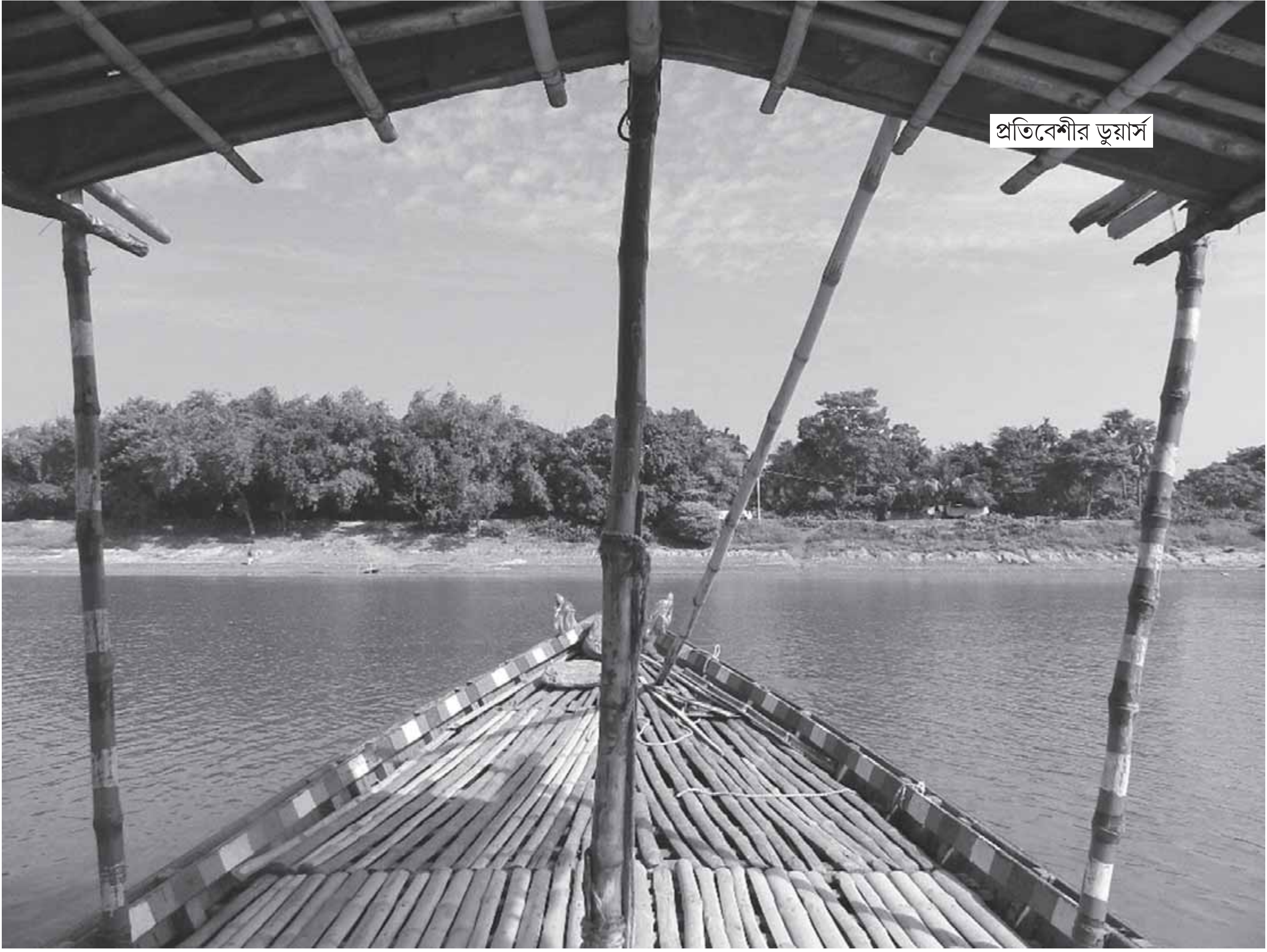

যেখানে নদী মানে ভূগোল নয়, ইতিহাস

নদী ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা লিখলে এখন কেউ যদি ওজর-আপত্তি তোলে তাহলে তাকে আর বোধহয় দোষ দেওয়া যাবে না। এ কথা শুনে বিশুদ্ধবাদীরা যদি চোখ কপালে তোলেন, ভুরু কুঁচকে ফেলেন তাহলে তাঁদের জন্যও উত্তর আছে। হ্যাঁ ঠিকই, নদী ইতিহাসে পড়ানোর বিষয় নয়, ভূগোলেরই বিষয়। কিন্তু ছোটবেলায় দেখা অনেক নদী কি আগের মতো আছে? অভিজ্ঞতা বলে, অনেক নদীই হারিয়ে গিয়েছে বা হারিয়ে যাওয়ার পথে পা বাড়িয়েছে। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে নদী কি ক্রমশ অতীত হয়ে যাচ্ছে না? অতীত যা কিছু তা তো ইতিহাসেরই বিষয়। তা হঠাৎ নদী নিয়ে এইরকম প্রতিবেদনের কারণ কী? কারণ, সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুরে স্থানীয় বেশ কিছু নদী হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সামনে এসেছে। সে কী, নদী তাহলে ইতিহাস হয়ে গেল?

ঘটনাটা কী?

রহিতা, বীণা, কাঞ্চন, গাঞ্জার, বেরহত্তা, গায়রা, দোলঞ্চা, চিরামতি— একসঙ্গে আট-আটটি নদী নাকি হারিয়ে গিয়েছে। এমনই দাবি করছেন স্থানীয় মানুষ। তাঁদের দাবিটা কি ঠিক? কিছুদিন আগেও নাকি বর্ষার সময় দু'কূল ছাপিয়ে জল প্রবাহিত হত এই নদীগুলোতে, এখন নাকি প্রায় জলই নেই। ভাবা যায়! বলে কী? পুরোপুরি গায়েব?

কিন্তু কেন?

নদীগুলোতে এখন আর জল নেই। নদীগুলো এখন চাষের খেতে পরিণত হয়েছে। জল না থাকলে নদী কি আর নদী থাকে? বলছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

আর কোনও কারণ?

আছে তো! নদীর নিচে জল না থাকলে উপরে থাকবে কেমন করে? বর্ষার ক'মাস বৃষ্টির জলে না হয় পুষ্ট হল, কিন্তু তারপর? বছরের অন্যান্য সময় যে পরিমাণে শ্যালো, সাবমার্সিবল পাম্প ব্যবহৃত হয়, সেটাই মাটির নিচের জল পুরোপুরি তুলে নিচ্ছে। জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে, খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়ছে অনেক বেশি হারে (এ প্রসঙ্গে থমাস রবার্ট ম্যালথাসের 'ম্যালথুসিয়ান থিয়োরি অব পপুলেশন গ্রোথ' উল্লেখযোগ্য)। উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার জলের ব্যবহার বাড়িয়েছে বহু গুণ। ফলে মাটির নীচ থেকে ভৌম জল তোলা

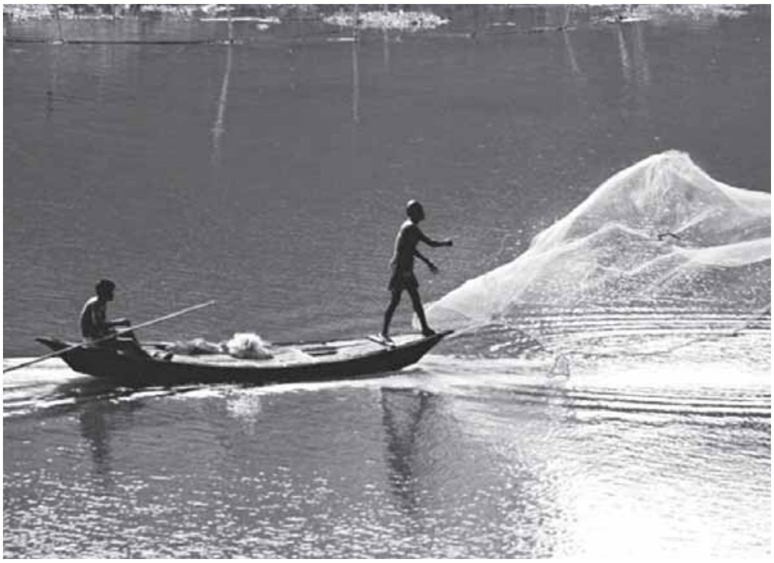

হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। আর সেটাই নদীর জলহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ। নদীজমিও পরিণত হচ্ছে কৃষিজমিতে।

কী বলছেন নদী বিশেষজ্ঞ?

নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র বিষয়টি নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। তিনি অত্যন্ত হতাশ কণ্ঠে জানালেন, 'হাইড্রো-জিয়োমরফোলজি'ই তো পালটে গিয়েছে। তাহলে কি হারিয়ে যাওয়া নদী আর ফেরানো সম্ভব নয়? কী করে সম্ভব? আমাদের মোট জমির প্রায় ৬৫ শতাংশ কৃষিজমি। মাটির নীচ থেকে জল তোলা হচ্ছে যথেচ্ছভাবে। আগেকার ভৌগোলিক পরিবেশই তো নেই। যদি নদী হারিয়ে যায় তাহলে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

সরকারি কোনও উদ্যোগ?

উত্তর দিনাজপুর জেলা সেচ দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার প্রশান্ত দাস বলেন, 'নদীভাঙন হলে তা ঠেকানোর একাধিক পরিকল্পনা আছে। কিন্তু নদী বাঁচানোর কোনও প্রকল্প আমাদের নেই। তবে হ্যাঁ, ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে নদী সংস্কারের কাজ আমরা করি।'

উত্তর দিনাজপুরের ওই নদীগুলো তো একটা উদাহরণমাত্র। কিংবা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়েই নদীগুলোর অবস্থা সঙিন। দক্ষিণ দিনাজপুরের কথাই যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে, জেলার প্রধান নদী আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, টাঙ্গনে বর্ষার সময় ছাড়া জলই থাকে না। দেখে বোঝার উপায় নেই যে এগুলো নদী। এই তো ক'দিন আগে জলপাইগুড়ির তিস্তা, জলঢাকা, মালদহ-শিলিগুড়ির মহানন্দা, কোচবিহারের তোর্সা, আলিপুরদুয়ারের কালজানি দেখলাম। নদীর বৈশিষ্ট্য প্রায় নেই বললেই চলে। নদীগুলো যেভাবে ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে, তাতে সংকট খুব তীব্র। বড় নদীগুলোরই যখন এই হাল, তখন উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলার অসংখ্য ছোট নদীর কী হাল তা সহজেই অনুমেয়। দক্ষিণ দিনাজপুরের যমুনা, শিলিগুড়ির পঞ্চনই, ময়নাগুড়ির জর্দা, জলদাপাড়ার হলং এবং অসংখ্য ছোট নদী তো প্রায় হারিয়ে যাবার মুখে।

তাহলে আমরা যে বলি নদীমাতৃক...?

নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র বললেন, 'ভারতবর্ষে নদীমাতৃক বিষয়টি গুরুত্বই পায়নি কোনও কালে। তাহলে কি আর ভারতের প্রধান নদী গঙ্গার এই হাল হয়?' তাহলে নদীগুলো যে সাধারণ মানুষের জীবন, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ছিল, প্রচুর কর্মসংস্থানের সঙ্গে জড়িত ছিল, তার কী হবে? কোথাও কি কোনও আশার আলো নেই?

কিছুটা এখনও আছে।

রায়গঞ্জ বিভাগীয় বনাধিকারিক দ্বিপর্ণ দত্ত নদী বাঁচাতে নদীর ধারে মেহগনি, জারুল, কদম, অর্জুন ইত্যাদি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন। উত্তরের বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন নদী বাঁচানোর আন্দোলন গড়ে তুলেছেন— এটুকুই যা আশার আলো। তবে সরকারি পরিকল্পনা ও উদ্যোগ চাই। নদী অচিরেই আর ভূগোল থাকবে না, হবে ইতিহাস। এটাই সারসত্য কথা।

এখন ডুয়ার্স ক্যামেরা ক্লাব

অগাস্ট ১, ২০১৬ থেকে চালু হয়ে গেল 'এখন ডুয়ার্স ক্যামেরা ক্লাব'। ডুয়ার্সের প্রকৃতি, মানুষ, বন্য প্রাণ ও নানাবিধ ঘটনাকে ফ্রেমে বন্দি করার সংঘবদ্ধ প্রয়াস। ছবি তোলা যাঁদের নেশা, তাঁরা যে কেউ এই ক্লাবের সদস্য হতে পারেন।

- এক বছরের সদস্য চাঁদা ৫০০ টাকা।
- সদস্যদের সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হবে।
- সদস্যরা তাঁদের বাছাই করা ছবি নিয়মিত পাঠাতে পারবেন অনলাইন।
- মাসে একবার আড্ডাঘরে সদস্যদের বৈঠক বসতে পারে। সেখানে বাছাই করা ছবি দেখা ও আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে।
- ত্রৈমাসিক ওয়ার্কশপ-ফোটোওয়াক হবে অভিজ্ঞ ফোটোগ্রাফারের তত্ত্বাবধানে।
- বাছাই করা ছবি নিয়ে কলকাতা ও জলপাইগুড়িতে বছরে দু'বার চিত্র প্রদর্শনী হবে।
- নির্বাচিত ছবি 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ছবিপ্রতি সম্মানদক্ষিণা পাবেন চিত্রগ্রাহক। বছরে দু'বার এই দক্ষিণা সাকুল্যে দেওয়া হবে।
- পাঠানো ছবি ফেসবুক বা অন্য কোথাও ব্যবহার করা যাবে না।
- সদস্য হতে গেলে চেক পাঠাতে হবে Ekhon Duars নামে।
- আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ— অমিতেশ চন্দ। আড্ডাঘর। মুক্তাভবন। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি। ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭।

টোটোপাড়ার জলছবি

আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট থানার ২১ কিলোমিটার দূরে ভারত-ভুটান সীমান্তে টোটোপাড়া গ্রামে বসবাস করে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম আদিবাসী টোটো সম্প্রদায়। টোটোপাড়ার অবস্থান ভৌগোলিক বৈচিত্রে ভরা। পূর্বে তোর্সা নদী, দক্ষিণে জলদাপাড়া বন ও লঙ্কাপাড়া। পশ্চিমে পদুয়া পাহাড় এবং উত্তরে হিপসা পাহাড়। এই দু'টি পাহাড় টোটোদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়দেবতা। গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট ঝরনা শীতে শুকনো থাকে। বর্ষায় কলকল শব্দে মুখরিত হয়। ভারতের শেষ প্রান্তের গ্রাম। তারপরেই প্রতিবেশী দেশ ভুটান। টোটোপাড়ার চারপাশে আম, কাঁঠাল এবং ঘন সুপারি বাগান। মোট আয়তন ২,০০০ একর।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে টোটোরা টিবেট-মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠীর একটি শাখা। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি আদিম আদিবাসীর মধ্যে টোটো অন্যতম। টোটোদের শারীরিক গঠন সুঠাম। চুল দৃঢ় ও সবল। দাড়ি-গোঁফ বিরল। নাকের গঠন এবং চোখের পাতার গঠনে মান্দালয়েড জনগোষ্ঠীর বিশিষ্ট লক্ষণ বর্তমান। ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, টোটো ভাষা ইন্দো-মান্দালয়েড ভাষা গোষ্ঠীর উপহিমালয় বর্গের অন্তর্গত।

টোটো সম্প্রদায়ের মানুষরা কীভাবে টোটোপাড়াতে বসবাস শুরু করল, সেই বিষয়ে সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। বিভিন্ন গবেষক যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা থেকে জানতে পারা যায় যে, প্রায় সাত পুরুষ আগে তারা এখানে বসবাস শুরু করে। তার পূর্বে তারা বা তাদের পূর্বপুরুষরা বনে বনে ঘুরে বেড়াত। সংগ্রহ করত জঙ্গলের ফলমূল, জড়িবুটি। মৃত জন্তুজানোয়ারদের হাড়-দাঁত ইত্যাদিও সংগ্রহ করত। লোকালয়ের মানুষের সঙ্গে সংগৃহীত জিনিসপত্র বিনিময় করে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে তারা জীবনযাত্রা সম্পন্ন করত। জানা যায়, ১৮৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ভুটান যুদ্ধের সময়ে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের সেনাবাহিনীর রসদবাহী কাজে নিয়োগ করা হয়। শোনা যায়, এই যুদ্ধে যারা টোটোর বস্তা বহন করে ইংরেজ বাহিনীকে সাহায্য করেছিল, তাদের বলা হত টোটা বা টোটো। কথিত আছে, আজকের টোটোরা সেই টোটা বহনকারীদের বংশধর। আবার অনেকে মনে করেন, টো-টো করে তারা বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়াত বলেই তারা টোটো নামে পরিচিত।

মাদারিহাট থেকে ২১ কিলোমিটার টোটোপাড়ার পথে একদিকে যেমন রয়েছে নেপালি এবং আদিবাসীদের বসতি, তেমনি অন্য দিকে রয়েছে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ চা-বাগান, রয়েছে ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝে পাহাড়ি পথে নিবিড় অরণ্য আর অসংখ্য পাহাড়ি ঝোরা-নদী— শীতে ধু ধু বালিরাশি আর বর্ষায় ভরা যৌবনা ভয়ংকরী রূপ। দূরে তোর্সা নদীর পাড়ের অপরূপ সৌন্দর্যের হাতছানি, যা আপনার মনকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দেবে। এভাবেই হাউরি নদী পেরিয়ে গেলেই টোটোপাড়া আপনাকে দু'হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানাবে— 'ওয়েলকাম টু টোটোপাড়া'।

টোটোপাড়ায় রয়েছে ছয়টি গ্রাম— দুমসি গাঁও, পূজা গাঁও, মিত্রং গাঁও, সুব্বা গাঁও, মণ্ডল গাঁও ও পঞ্চায়েত গাঁও। ছয়টি গ্রামে ৩৪৩টি পরিবারের মোট ১,৫৬৩ জন মানুষ বসবাস করেন (পুরুষ ৮১৩, মহিলা ৭৫০, ৩১-১-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত)।

ইংরেজরা ডুয়ার্স অধিগ্রহণের পর থেকেই টোটোরা তাঁদের প্রথাসিদ্ধ জীবিকা ছেড়ে ক্রমশ কৃষিজীবী এবং দিনমজুরে পরিণত হয়েছেন। ইংরেজ সরকার বহিরাগতদের আগ্রাসন থেকে টোটোদের কৃষিজমি রক্ষার জন্য ১৮৮৭ সালে সেই সময়ে টোটো গোষ্ঠীপতি ধনপতি টোটোর নামে ১৯৯৩.৭৯ একর জমি সংরক্ষণ করেছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সালে ভূমিসংস্কার আইনে টোটোদের অধিকাংশ কৃষিজমি খাস জমিতে পরিণত হয়েছে। ফলে টোটোরা এখন নিজ বাসভূমেই পরবাসী। বর্তমানে মোট ৩৪৩টি টোটো পরিবারের অধিকাংশই ভূমিহীন চাষিতে পরিণত হয়েছেন।

প্রচলিত কাহিনি যে, টোটোপাড়াতে প্রথম যে তেরোজন টোটো বসতি স্থাপন করেছিলেন, সেই তেরোজন টোটোর বংশধররাই ১৩টি গোত্রে বিভক্ত হয়ে টোটোপাড়ায় বসবাস করছেন।

টোটোরা একসময় ছিলেন অরণ্যনির্ভর জনজাতি। পশু শিকার, কাঠ, বুনো ফলমূল সংগ্রহই ছিল তাঁদের প্রধান জীবিকা। সেই সময় তাঁরা ঝুম চাষেও অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও জীবিকার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এসেছে। একসময়ে টোটোপাড়ায় ভাল কমলালেবুর বাগান ছিল। সমতলের মানুষরা টোটোদের কাছ থেকে কমলালেবু ও কাঠ কিনে নিয়ে যেত। টোটোরা শিরীষ গাছে লাক্ষার চাষ করতেন। লাক্ষা ও সুপারি বিক্রয় করেও তাঁরা অর্থ উপাজন করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁদের অর্থাগমের পথগুলি বন্ধ হয়ে যায়। কমলাবাগানগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সমতলের কাঠ ব্যবসায়ীরা শিরীষ গাছগুলি কেটে নিয়ে গিয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে তাঁরা একসময়ে ভুটান থেকে কমলালেবু বহন করে সমতলে কমলার আড়তে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু এইসব কাজে তাঁদের আর্থিক অনটন ঘোচেনি। ইংরেজরা ডুয়ার্স অধিগ্রহণের পর থেকেই টোটোরা তাঁদের প্রথাসিদ্ধ জীবিকা ছেড়ে ক্রমশ কৃষিজীবী এবং দিনমজুরে পরিণত হয়েছেন। ইংরেজ সরকার বহিরাগতদের আগ্রাসন থেকে টোটোদের কৃষিজমি রক্ষার জন্য ১৮৮৭ সালে সেই সময়ে টোটো গোষ্ঠীপতি ধনপতি টোটোর নামে ১৯৯৩.৭৯ একর জমি সংরক্ষণ করেছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সালে ভূমিসংস্কার আইনে টোটোদের অধিকাংশ কৃষিজমি খাস জমিতে পরিণত হয়েছে। ফলে টোটোরা এখন নিজ বাসভূমেই পরবাসী। বর্তমানে মোট ৩৪৩টি টোটো পরিবারের অধিকাংশই ভূমিহীন চাষিতে পরিণত হয়েছেন। বর্তমান সময়ে (২০১৪-এর ৩১ জানুয়ারি) টোটোদের মাত্র ৩৭ জন নানা সরকারি আধা সরকারি কাজে যুক্ত রয়েছেন।

টোটোরা প্রকৃতির উপাসক। টোটো জনজাতির মন্দিরে কোনও বিগ্রহ নেই। তাঁরা নদী, গাছ, পাহাড়, ভূমিকে দেবতারূপে পুজো করেন। প্রতিটি পরিবারে গৃহদেবতা থাকলেও টোটোদের প্রধান দেবতা 'ঈশপা'। এই দেবতা একই সঙ্গে পুরুষ ও নারী। পুরুষরূপে তাঁর নাম 'মহাকাল' এবং নারীরূপে তাঁর নাম 'সইনঝানি' বা 'মহাকালী'। টোটোদের দ্বিতীয় প্রধান দেবতা ঈশপার খুড়তুতো ভাই 'মননাঙ্গ' চা 'পিদুয়া'। কিন্তু তাঁর সঙ্গে শয়তান বা অপদেবতার সম্পর্ক রয়েছে। ভূতপ্রেত ও অপদেবতাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য টোটোরা পিদুয়াকে সন্তুষ্ট রাখতে চান।

টোটোদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দু'টি— 'ওমচু পূজা' এবং 'ময়ূ পূজা'। এই দু'টি পূজাই দেবতা ঈশপার উদ্দেশে নিবেদিত। প্রতি বৎসর জুলাই মাসের শেষ কিংবা অগাস্ট মাসের প্রথমে ওমচু পূজা ধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় নতুন কাউন ওঠে বলে একে 'কাউনি' পুজোও বলা

হয়। টোটোরা মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী নন। দু'টি বড় বড় ঢোলকেই (বাকুং) তাঁরা মহাকাল ও মহাকালীর প্রতীক বলে পূজা করেন। ঢোল দু'টির নাম— চিগাইমু ও মুগাইমু। সারা বছর ওই ঢোল দু'টি পূজাবাড়িতে (ডেমসা) ঝোলানো থাকে। ওমচু পূজার সময়ে ঢোল দু'টি নামিয়ে এনে ধর্মীয় সংগীতের সঙ্গে বাজানো হয়। আগে ওমচু পূজা পাঁচ দিন ধীরে চলত। কিন্তু বর্তমান সময়ে তিন দিনেই পূজা সমাপ্ত হয়। ওমচু পূজার ২২ দিন পর অমাবস্যা তিথিতে ময়ূ পূজা আরম্ভ হয়। পূর্বে এই পুজো ৯ দিন চললেও এখন চলে মাত্র পাঁচ দিন। এই ময়ূ পূজাকে টোটোরা বলেন বড় পূজা এবং ওমচু পূজাকে বলে ছোট পূজা।

টোটো সমাজে গোত্র অনুযায়ী একটি পরিবার বা কয়েকটি পরিবার মিলে গোত্র-কুলদেবতার পূজা করে থাকে। দুই বছর বা পাঁচ বছর পরপর এই পূজা হয়। এই কুলপূজার নাম টোটো ভাষায়— 'চইসুন'। মূলত একটি বা দু'টি গোরু বলি দেওয়ার প্রথা আছে। টোটো সমাজে ঘরের ভিতরে অনেক প্রকারের পূজা হয়। যেমন— কুলপূজা, চইসুন, জিরং কোবে, সাংকা-মানকা। ঘরের বাইরে— সাতরিং, জিদিং, কুংরি, বারাইগারি-নুচে, মূলত ভূমি পূজা, পাহাড় পূজা— পাদুওয়া, নদী পূজা— তোর্সা মেরে-মধি, লাপু-ভিস্তি, দাংতেনডি-হইনডি, পাথরের পূজা— বিরকোচইসুন, পকিংসওয়া

একদিনেই টোটোপাড়া ঘুরে দেখা যায়। একটু কষ্টসাধ্য। উঁচুনিচু পাহাড়ি পথে পাহাড়ের ঢালে টোটোদের ছয়টি গ্রাম। ইতস্তত ছড়ানো টোটোদের বাসগৃহ, তাদের যাপনচিত্র। ঘুরে দেখা যায় ওদের দেবতাগৃহ ডেমসা। ডেমসায় রক্ষিত ধর্মীয় প্রতীক দু'টি ঢোল। টোটোদের পবিত্র গোয়াতি নদী, যেখানে তাদের জাতীয় উৎসব ময়ূ ও ওমচু পূজা অনুষ্ঠিত হয়। টোটোদের সরদে বা বসন্তকালীন উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় এই গোয়াতি নদীর তীরে।

ইত্যাদি। এই সকল পূজায় বিভিন্নভাবে পশু বলি দেওয়ার প্রথা আছে।

টোটো সমাজ পরিচালনার জন্য পাঁচটি পদের নাম করা হয়ে থাকে— কাইজি (পুরোহিত), গাপ্পু (মোড়ল), পঞ্চায়েত, পাও (ওঝা) ও নামপন। নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচিত হবার ফলে টোটো সমাজে পঞ্চায়েত পদ লুপ্ত হয়েছে।

টোটোদের বাসগৃহ নির্মাণেও বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। টোটোরা তাদের বাসগৃহকে বলে— না-কে-শা। এই বাসগৃহ নির্মাণের মধ্যে আদিমতার ছাপ রয়েছে। বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপরে খড়ের দোচালা ছাউনি দিয়ে তারা ঘর নির্মাণ করে। ঘরগুলি লম্বায় ১২ থেকে ১৫ ফুট, চওড়ায় ৮ থেকে ১০ ফুট। মাটি থেকে সাধারণত ৫/৬ ফুট উচ্চতায় গোটা বাঁশ কিংবা বাঁশের কাবারি দিয়ে ঘরের মেঝে তৈরি করা হয়। বাঁশের কাবারি দিয়েই ঘরের বেড়া দেওয়া হয়। চওড়া একটা উন্মুক্ত বারান্দা থাকে। বারান্দাটি ঘরের পাটাতন থেকে ৮ ইঞ্চি/১০ ইঞ্চি নিচে তৈরি করা হয়। বারান্দায় ওঠার জন্য একটি খাঁজকাটা গাছের গুঁড়ি সিঁড়ির মতো ব্যবহার করা হয়। এই সিঁড়িকে বলে 'কাইবু'। টোটোদের বাসগৃহে একটিমাত্র কক্ষ। এই একটি কক্ষের মধ্যেই গৃহদেবতার স্থান (চি-সা), রান্নার স্থান (মে-রিং), শোয়ার জায়গা (সিরি), অতিথির শোয়ার জায়গা (দেইচি-কো-সিরি) নির্দিষ্ট করা থাকে। টোটোদের ঘরের সম্মুখে উন্মুক্ত বারান্দাটি নানারকম কাজে ব্যবহৃত হয়। অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে গল্পগুজব এবং সংসারের যাবতীয় কাজের জায়গা এই বারান্দা। টোটোরা ঘরের নিচে বাঁশের বেড়া দিয়ে হাঁস-মুরগি ও শূকর পালন করে থাকে। গৃহ নির্মাণের জন্য দড়ির বদলে ওদলা গাছের ছাল ব্যবহার করে।

একদিনেই টোটোপাড়া ঘুরে দেখা যায়। একটু কষ্টসাধ্য। উঁচুনিচু পাহাড়ি পথে পাহাড়ের ঢালে টোটোদের ছয়টি গ্রাম। ইতস্তত ছড়ানো টোটোদের বাসগৃহ, তাদের যাপনচিত্র। ঘুরে দেখা যায় ওদের দেবতাগৃহ ডেমসা। ডেমসায় রক্ষিত ধর্মীয় প্রতীক দু'টি ঢোল। টোটোদের পবিত্র গোয়াতি নদী, যেখানে তাদের জাতীয় উৎসব ময়ূ ও ওমচু পূজা অনুষ্ঠিত হয়। টোটোদের সরদে বা বসন্তকালীন উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় এই গোয়াতি নদীর তীরে। এ ছাড়া প্রতিটি পরিবারই গোয়াতি নদীর পূজা দিয়ে থাকে। সোজা হেঁটে যাওয়া যায় নদীর পাড় ধরে অনেক দূর পর্যন্ত। আবার হাতে যদি সময় থাকে, তবে দেখে নেওয়া যায় টোটোপাড়ার পাহাড়ে ভারত-ভুটান সীমান্ত পিলার। পিলারের ওপারেই অন্য প্রতিবেশী দেশ ভুটান। সে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। পাহাড়ের ঢালে সবুজের অপূর্ব ল্যান্ডস্কেপ। রাত্রে থাকারও কোনও অসুবিধা নেই এই সময়ে টোটোপাড়ায়। শুধু যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়—

১) টোটোপাড়া অনগ্রসর সম্প্রদায় শ্রেণি কল্যাণ বিভাগের বাংলো যোগাযোগ- ০৩৫৬১-২৩০৬৬৫/০৩৫৬৪-২৫৫৩০৮।
২) বেসরকারি টোটোপাড়া রেস্ট হাউস, প্রযত্নে ভবেশ টোটো। যোগাযোগ- ৯৭৩৩৩৭১৯৮৫।

৩) হোমস্টে, ইন্দ্রজিৎ টোটো। যোগাযোগ- ৯৭৩৩৩৮৭৬৫১।

৪) ল্যাম্পস আয়োজিত টুরিজম সেন্টার, অশোক টোটো। যোগাযোগ- ৯৭৩৩২৭৪৫৫৮।

৫) হোমস্টে, রূপচাঁদ টোটো। যোগাযোগ- ৯৬৭৯১৭৪৪৭০।

এ ছাড়া সমস্ত প্রকার সহযোগিতার জন্য যাঁরা সর্বদাই প্রস্তুত—
ধনীরাম টোটো, সমগ্র টোটোপাড়া যাঁর নখদর্পণে।

রূপচাঁদ টোটো, পঞ্চায়েত সদস্য।

ভক্ত টোটো, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার।

অশোক টোটো, সমাজকর্মী।

টোটোপাড়া বিষয়ে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য—

টোটোপাড়ার পাহাড়— পদুয়া, হিসপা, দক্ষিণ দপ্রুংলাকা।

টোটোপাড়ার নদী— হাউরি-কাংদুংতি নদী, দাতিংতি, দীপ্তি, চুয়াতি, নিতিংতি, জৈপ্তি, গোয়াতি, নামসিডি, কিতিংতি, সুটি (তোর্সা), উদিংতি, মেরেমতি ইত্যাদি।

টোটোপাড়ার ছয়টি গ্রাম ও পরিবারসংখ্যা—

দুমসি গাঁও—বৌধবি গাঁও—পরিবার—৩৭।

পূজা গাঁও—বুধবে গাঁও—পরিবার—২৪

মিত্রং গাঁও—মিত্রন টোটোর নামে—পরিবার—৩৫।

সুব্বা গাঁও—কাইজি গাঁও—পরিবার—৮২।

মণ্ডল গাঁও—গাপ্পু গাঁও—পরিবার—২৯।

পঞ্চায়েত গাঁও—পঞ্চায়েতদের নামে গাঁও—পরিবার—১৩৬।

মোট পরিবারসংখ্যা—৩৪৩।

মোট জনসংখ্যা— ১,৫৬৩ (২০১৪-র ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত)

বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত (টোটোদের মধ্যে স্নাতক)—

সনজিৎ টোটো (ছেলেদের মধ্যে প্রথম স্নাতক), জগদীশ টোটো, গেটে টোটো, রীতা টোটো (মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্নাতক), ধনঞ্জয় টোটো, প্রকাশ টোটো, সঞ্চিতা টোটো, শোভা টোটো।

সরকারি-আধা সরকারিভাবে কর্মরত ছিলেন অথবা বর্তমানে আছেন এমন আদিবাসীর সংখ্যা— ৩৭।

আদিম আদিবাসী টোটো মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্কুলমুখী মহিলা ছিলেন— দেবী টোটো (১৯৬৫), পিতা আমেশ টোটো, স্বামী গোপাল টোটো।

চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ প্রথম টোটো— রবি টোটো (১৯৬৬)

অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ প্রথম টোটো— মুক্তারাম টোটো (১৯৭৫), মজুমদার-বোস জুনিয়র স্কুল, দিনহাটা, কোচবিহার।

টোটোদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাধ্যমিক পাশ— চিত্তরঞ্জন টোটো (১৯৭৯)।

অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ প্রথম মহিলা— গৌরী টোটো, ধনপতি টোটো মেমোরিয়াল হাই স্কুল।

প্রথম মাধ্যমিক মহিলা পরীক্ষার্থী— সাধনা টোটো।

মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাধ্যমিক পাশ— সূচনা টোটো (২০০৩), রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়, ম্যাক উইলিয়াম হাই স্কুল, আলিপুরদুয়ার।

একই বছর রীতা টোটো ধনপতি টোটো মেমোরিয়াল হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন।

মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্নাতক— রীতা টোটো (২০১০), জলপাইগুড়ি প্রসন্নদেব মহিলা কলেজ।

মহিলাদের মধ্যে প্রথম অনার্স নিয়ে স্নাতক— সঞ্চিতা টোটো (২০০৩)। বিষয়- ইংরেজি।

২০১৪ পর্যন্ত ১০০ জন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পাশ করেছে।

মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়ার দূরত্ব ২১ কিলোমিটার। হাটবার মঙ্গলবার।

যাতায়াতের যানবাহন— জিপগাড়ি, নিজস্ব গাড়ি। বেসরকারি বাস একটি, দিনে দু'বার। টোটোপাড়া-মাদারিহাট বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত।

গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস—
বল্লালগুড়ি-টোটোপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস।

প্রমোদ নাথ

তথ্যসূত্র- লোকস্বর পত্রিকা
সম্পাদনা- প্রমোদ নাথ, ড. জীবন রানা
ব্যক্তিগত সহযোগিতা- ধনীরাম টোটো, ভক্ত টোটো, রীতা টোটো, রূপচাঁদ টোটো, অশোক টোটো (টোটোপাড়া)।

দেবপ্রসাদ রায়

বহুলপঠিত এই ধারাবাহিকের বর্তমান পর্বে বর্ণিত হয়েছে লেখকের সঙ্গে তাঁর প্রিয় নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর মতপার্থক্যের কাহিনি। জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তখন টানটান উত্তেজনা। তৈরি হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধ পক্ষ। উঠে আসছেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। তবে কি প্রিয়দার সঙ্গে লেখকের ব্যবধান তৈরি হল? দার্জিলিঙে সঞ্জয় গান্ধির সঙ্গে কেন যোগাযোগ হল লেখকের? কী বললেন তিনি? একের পর এক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার ঘনঘটায় জমজমাট এবারের পর্ব।

১৬

রাজ্যে কংগ্রেস সরকার। অথচ উন্নয়নের দাবি জানিয়ে যুব কংগ্রেস 'উত্তরবঙ্গ বন্‌ধ'-এর ডাক দিল। অনুগত সৈনিকের মতো সেই বন্‌ধ পালন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলাম, কিন্তু বুঝলাম না যে এতে কার লাভ হল। আরেকবার ঠিক হল যে, যুব কংগ্রেস আর পশ্চিমবঙ্গ যুব সংঘ (সিপিআই-এর যুব শাখা) যৌথভাবে মহাকরণ অবরোধ করবে। শুনে মানুদা খেপে লাল। অবশেষে সমঝোতা হল যে, মহাকরণের যাওয়ার ১৮টা রাস্তার মধ্যে আমরা দশটা আটকাব আর বাকি আটটা খোলা থাকবে। আমার দায়িত্ব পড়ল ব্রাবোর্ন রোডে টি বোর্ডের সামনে। ছেলেদের নিয়ে রাস্তায় বসে আছি। ডিসি সেন্ট্রাল হায়দর সফি এসে বললেন, 'এবার উঠুন।' আমি বললাম, 'আরেকটু বসতে দিন।' খানিক পর লাল ঝান্ডা নিয়ে যুব সংঘের একটা মিছিল এগিয়ে আসতে লাগল। আমি বললাম, 'এবার তুলুন। আর ওই মিছিলটাকে পিটিয়ে তুলুন!'

পরে যখন যুব সংঘের ছেলেরা প্রেসিডেন্সি জেলে বাস থেকে নামছিল, তখন লক্ষ করেছিলাম যে অনেকেই তাদের মধ্যে খুঁড়িয়ে হাঁটছে!

একটা কথা নির্দ্বিধায় বলব যে, আমায় প্রিয়দা নিরাপত্তা দিতে না পারলেও আমাকে কিন্তু তিনি স্নেহ করতেন। কংগ্রেসের গোষ্ঠী রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কিছু গঠনমূলক কাজের দায়িত্ব আমায় বারবার দেওয়ার চেষ্টা করতেন সে সময়ে। জাতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে তিনি আমাকে জাতীয় কাউন্সিলেও বিশেষ সদস্য হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। জাতীয় কাউন্সিলের বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হওয়ার কারণে একটি ঘটনাবহুল দিনে আমি রাষ্ট্রীয় রাজনীতির সাক্ষী হলাম।

১৯৭৪ সালের ১২ জুন। জাতীয় যুব কংগ্রেসের জাতীয় পরিষদের সভা বসেছে মাউন্ট আবুতে। সে দিন ভোরবেলায় খবর এল, রাশিয়াতে ভারতের রাষ্ট্রদূত ডি পি দার, যিনি ইন্দিরাজির ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। দুপুরে খবর পেলাম, এলাহাবাদে আদালতের নির্বাচন সংক্রান্ত মামলায় ইন্দিরাজি হেরে গিয়েছেন। সন্ধের একটু আগে খবর পেলাম, গুজরাতে আমাদের কংগ্রেসি সরকারের পত্তন ঘটেছে। চিমনভাই পটেলের নেতৃত্বে গুজরাতে নতুন সরকার এল। এই ঘটনা থেকে যিনি বিপুল আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিলেন, তিনি হলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ।

গুজরাতে সংরক্ষণ ইস্যুকে কেন্দ্র করে প্রবল ছাত্র আন্দোলন হয়েছে তার আগে। আন্দোলন পরিচালনা করছিল নবনির্মাণ সমিতি নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। সে আন্দোলনের তীব্রতা এত জোরালো ছিল যে, গুজরাতের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ঘনশ্যাম ওঝা সরকার ভেঙে দিতে বাধ্য হন এবং নির্বাচন হলে আমাদের দল হেরেও যায়। নবনির্মাণ সমিতির প্রভাব বিহারে পড়েছিল সাংঘাতিক। ফলে সেখানেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেই আন্দোলনের ফসল হলেন আজকের নীতীশ

কুমার, লালুপ্রসাদ যাদবরা। তাঁদের সংগঠনের নাম ছিল 'ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি'। জয়প্রকাশ নারায়ণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই সমিতি তাঁকে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। নেতৃত্ব পাওয়ার পর জেপি খুব কম সময়ের মধ্যে দেশে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলায় বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহের জন্য আহ্বান জানালে ইন্দিরাজি আর ঝুঁকি নেননি। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন।

মাউন্ট আবুতে যখন দুঃসংবাদগুলি আসতে শুরু করল, তখন অনেকেই চাইছিলেন সভার কাজ স্থগিত রেখে ইন্দিরাজির পাশে দাঁড়াতে। কিন্তু প্রিয়দা সেটা মানেননি। মানলে হয়ত ভালই করতেন। ইতিমধ্যে আমরা কানাঘুষোয় শুনলাম যে, ইন্দিরাজি চাইছেন ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধিকে রাজনীতিতে আনতে। প্রিয়দার এতে ঘোরতর আপত্তি ছিল। রাজ্য কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্য, গনি খান চৌধুরী, পঙ্কজ ব্যানার্জি, লক্ষ্মীকান্ত বসুর মতো একঝাঁক নেতা— এঁরা একাধারে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং প্রিয়-সুব্রতর বিরোধী ছিলেন। এঁরা এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে মানুদা এবং জাতীয় রাজনীতি থেকে প্রিয়দাকে উপড়ে ফেলাটাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

প্রিয়দা একদিন অরুণদার বাড়িতে ডেকে জানালেন যে, সঞ্জয় গান্ধি রাজনীতিতে আসতে চাইছেন এবং যুব কংগ্রেসেই আসতে ইচ্ছুক তিনি। কিন্তু এই আগমন যে প্রিয়দা একেবারেই মানবেন না, সেটাও জানালেন। শুনে সৌগতদা, সুদীপ প্রত্যেকেই বলল যে, প্রিয়দা যে পথে যাবেন, তারাও সে পথেই চলবে। আলোচনার শেষে ওরা সবাই চলে গেলে আমি প্রিয়দাকে বললাম যে, ইন্দিরাজিকে চটালে চলবে না। সঞ্জয় গান্ধি যুব কংগ্রেসে যদি আসতে চান, তবে আপনি না চাইলেও তিনি আসতে পারবেন। ওঁর সঙ্গে আপনার চার দেওয়ালের মধ্যে কী কথা হবে তা আপনি ও সঞ্জয় গান্ধি ছাড়া তো আর কেউ জানতে পারছেন না, আপনি ওঁর সঙ্গে সমঝোতা করে নিন।

ফল হল এই যে, আমার পরামর্শ শুনে প্রিয়দা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর প্রায়ই কানে আসতে লাগল যে প্রিয়দাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবশেষে একদিন কাগজে দেখলাম প্রিয়দা অপসারিত। জাতীয় যুব কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হয়েছেন অম্বিকা সোনি। এর কিছুদিন পর ইন্দিরাজি দলীয় কর্মসূচি উপলক্ষে দার্জিলিং আসবেন জানা গেল। আমাদের রাজ্য সভাপতি অরুণদা বললেন যে, দার্জিলিঙে সঞ্জয় গান্ধিও আসবেন। আমাদের তাঁকে গিয়ে বোঝানো উচিত যে প্রিয়দা একেবারে শিকড়হীন নয়। আর এটা বোঝাতে হবে দার্জিলিঙে বড়সড় একটা সমাবেশ করে।

দার্জিলিঙের চকবাজারে ছিল ইন্দিরাজির সভা। তার দিন পাঁচেক আগে লোক জোটানোর কাজ নিয়ে আমি আর আলিপুরদুয়ারের বিশু গেলাম দার্জিলিং। তখন বেজায় ঠান্ডা সেখানে। তার মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমরা সভায় দলীয় লোকজনদের আনার কাজ শুরু করলাম। ফলে সভার দিন দেখা গেল বিশাল বিশাল মিছিল আসছে। আর সব মিছিলে 'ইন্দিরাজি জিন্দাবাদ' স্লোগানের পাশাপাশি 'প্রিয়দা জিন্দাবাদ' স্লোগানও সমান তালে উঠছে। সভা খুব সফল হয়েছিল। সন্ধেবেলায় সুব্রতদা আমাকে বললেন, 'চলো। এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি।'

এই বলে তিনি আমায় নিয়ে এলেন রাজভবনে। সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে উদয় হলেন কমবয়সি টকটকে ফরসা রঙের এক সুদর্শন পুরুষ। বুঝলাম ইনিই সঞ্জয় গান্ধি। সুব্রতদা তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাদের সহকর্মী দেবপ্রসাদ।'

'কী করো?' সঞ্জয় গান্ধি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি রাজ্য যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক।'

'আর কী করো?'

'আর কিছু না। আমি দলের সর্বক্ষণের কর্মী।'

'তোমার বায়োডেটা দিয়ে যাও। আমি ঠিক কোথাও লাগিয়ে দেব।'

আমি তখন নম্রভাবে জানালাম, 'স্যার, আমি কোনও কাজ চাইতে আসিনি। তবে আপনি নেতৃত্ব দিলে আপনার সঙ্গে কাজ করব।'

এটা শুনে সঞ্জয় গান্ধি কী ভাবলেন জানি না। কিন্তু আমি একটা জিনিস অনুভব করতে পারলাম। প্রিয়দার প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্য তখন সঞ্জয় গান্ধির দুন স্কুলের সহপাঠী কমল নাথ ও আনন্দবাজারের প্রাক্তন সম্পাদক অভীক সরকার সূক্ষ্মভাবে যে চাল চেলেছিলেন, তার ফলে প্রিয়দার শিবিরের অন্যতম সেনাপতিকে তাঁরা ভাঙিয়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছেন। সেই সেনাপতির নাম সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

সত্যি কথা বলতে কী, প্রিয়দার অনুগামী হওয়ার কারণে জলপাইগুড়িতে মানুদার সমর্থকরা আমাকে যেমন শত্রু শিবিরের লোক ভাবত, তেমনই আলিপুরদুয়ারের

দার্জিলিঙের চকবাজারে ছিল ইন্দিরাজির সভা। তার দিন পাঁচেক আগে লোক জোটানোর কাজ নিয়ে আমি আর আলিপুরদুয়ারের বিশু গেলাম দার্জিলিং। তখন বেজায় ঠান্ডা সেখানে। তার মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমরা সভায় দলীয় লোকজনদের আনার কাজ শুরু করলাম। ফলে সভার দিন দেখা গেল বিশাল বিশাল মিছিল আসছে। আর সব মিছিলে 'ইন্দিরাজি জিন্দাবাদ' স্লোগানের পাশাপাশি 'প্রিয়দা জিন্দাবাদ' স্লোগানও সমান তালে উঠছে। সভা খুব সফল হয়েছিল।

ডেনিস লাকড়া আর অরুণ মৈত্রর স্নেহধন্য বিশ্বরঞ্জন সরকারের দলবলও আমাকে এড়িয়ে চলত। ফলে আমি ছিলাম কোণঠাসা। এই অবস্থায় সুব্রতদা আমার সামনে যে একটা দরজা খুলে দিয়েছিলেন, তার জন্য আমি আজও কৃতজ্ঞ বোধ করি।

কিছুদিন পর রাজ্য যুব কংগ্রেস পুনর্গঠিত হল। সভাপতি হলেন বারিদবরণ দাস। বীরেন মোহান্তি আর দেবপ্রসাদ রায় সাধারণ সম্পাদক। অচিরেই আমি প্রিয়দার শিবিরের কাছে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলাম। তবে আমার মনেও একটা কাঁটা খচখচ করত। ভাবতাম, কবে প্রিয়দার সঙ্গে বিরোধ মিটে যাবে। তাই শহিদ মিনারে অনুষ্ঠিত যুব কংগ্রেসের নতুন কমিটির প্রথম সভায় আমি যাইনি। একটু দূরে মেট্রো সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে সভার বক্তব্য শুনেছিলাম।

১৯৭৬-এ গুয়াহাটির জহর নগরে জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলন হল। একই সময়ে জলপাইগুড়িতে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সভা। আমি কোন সভায় যাব তা নিয়ে যখন দোদুল্যমান, তখন অভীক সরকার টেলিফোন করে জানালেন যে, সঞ্জয়জির কাছ থেকে আমাকে গুয়াহাটিতে যুব কংগ্রেসের সভায় যাওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

(ক্রমশ)

৩১

তরাই উৎরাই

যাব বললেই কি পরদিন আলিপুরদুয়ারের দিকে রওনা দেওয়া যায়? গোপাল ঘোষ উত্তেজিত অবস্থায় সে দিন রাতে বাড়ি ফিরে প্রথম বাস্তবের মুখে পড়লেন স্ত্রীর প্রশ্নে। তিনি রাতের খাওয়া শেষে পান চিবুতে চিবুতে বললেন, 'আলিপুরদুয়ার গেছ কোনও দিন? কিছু চেনো? দোকানপাট, হাটবাজারের খবর জানো? যদি ক'দিন থাকতে হয় সেখানে?'

উপেনকে গিয়েই খুঁজে পাওয়া যাবে, এমন দুরাশা গোপাল ঘোষ না করলেও কয়েকদিন থাকার ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। এবার মনে হল, হেরম্ব দত্তর বাড়িতে ক'দিন অতিথি হয়ে থাকলেও খালি হাতে কি যাওয়া যায়? কয়েক পাউন্ড চা, ভুটানি কম্বল, কিছু কেক-বিস্কুট, কমলালেবু— এইসব উপহার হিসেবে নিয়ে যাওয়া জরুরি। তার মানে দুটো গোরুর গাড়ি তো লাগছেই। আলিপুরদুয়ারে যাওয়া সোজা কথা নয় জলপাইগুড়ি থেকে। ছোটবড় নদী যে ক'টা পেরতে হবে, তার ঠিক নেই। রেললাইন আছে। মালগাড়িও যায়। কিন্তু গোপাল ঘোষ গোরুর গাড়ি ভেবেছেন। তাঁর কাঠের ব্যবসার আধা ম্যানেজার নরহরিবাবু একবার কাকে বলেছিলেন, 'গোরুর গাড়িতে দিন দুয়েকের রাস্তা মশাই। গাছগাছালি আর জঙ্গলের মধ্যে এই এইটুকখানি জনপদ হল আলিপুরদুয়ার। আমাদের কাঠ আসে। আমি জানব না!'

আসাম-আলিপুরদুয়ার থেকে কাঠ এলেও তা আনার লোক আছে। গোপাল ঘোষ নিজে অনেক জায়গায় গিয়েছেন, কিন্তু আসামের দিকে যাননি। তিস্তা দিয়ে স্টিমার ভাড়া করে ব্রহ্মপুত্র বেয়ে যাওয়াটা অবশ্যি কিছু না, তবুও ওদিকটায় যাওয়া হয়নি।

'আলিপুরদুয়ারে হেরম্ববাবুর বাড়িতে তার করে জেনে নাও অবস্থাটা কী।'

স্ত্রী পুনরায় পরামর্শ দিলেন। গোপাল ঘোষ তা-ই শুনে বললেন, 'হাতিটা নিয়ে গেলে হয় না? এখন তো শুকনো সময়। নদীগুলোয় খুব একটা জল থাকবে না।'

'গোরুর গাড়িতেই যাও। হাতি একটু বাড়াবাড়ি ঠেকবে। উপেন ছেলেটা যদি জানে যে জলপাইগুড়ি থেকে কেউ হাতি নিয়ে এসেছে, তবে পালিয়ে যাবে এলাকা ছেড়ে। ধন্যি ছেলে বটে! ধরে আনতে পারলে একবার দেখিয়ো তো আমাকে ওর মুখখানা।'

'ফোটো আসুক। আগেই দেখাব।' গোপাল ঘোষ পালঙ্কে টানটান হয়ে শুলেন। তাঁর মনে হল, রাত্রিটা সাঁ সাঁ করে ফুরিয়ে গেলে খুব ভাল হয়।

পরদিন সূর্য ওঠার আগে গোপাল ঘোষ নিজের ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে বার হলেন। প্রথমেই গেলেন খুদিদার বাড়ি। হেরম্ব ঘোষকে তার করার দায়িত্ব খুদিদাকে দিয়ে, চা খেয়ে গাড়ি ছোটালেন

বাহাদুরের দিকে। সেখানে তাঁর প্রিয় গাড়োয়ান লজ্জুর বাড়ি। তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, দিনবাজারের কোন কোন দোকান থেকে কী কী কতটা পরিমাণে একটা গাড়িতে বোঝাই করে রাখতে হবে। আরেকটা গাড়ি যেন গোপাল ঘোষের বাড়িতে আজই পাঠিয়ে রেখে দেয়। সেখানে বিছানা-বালিশ-লেপ-তোশক থেকে শুরু করে অনেক কিছু নেওয়ার আছে।

তারপর শহরে ঘুরে ঘুরে আলিপুরদুয়ার সম্পর্কে খবর জোগাড় করলেন। আধা ম্যানেজার নরহরিবাবু অতি উত্তেজিতভাবে বোঝালেন যে, সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না। তবে কালজানির ঘাটে দু'-চারটে দোকান থাকলেও থাকতে পারে। অবশ্য নরহরিবাবু যে ভ্রান্ত, তা দুপুর নাগাদ গোপাল ঘোষ টের পেলেন অম্বুজ নন্দীর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে করতে। 'আরে, এই তো পুজোর আগে ফিরলাম আলিপুরদুয়ার থেকে।' অম্বুজ নন্দী জানিয়ে দিলেন, 'হেরম্ববাবু থাকেন দত্তপট্টিতে। সেটা কালজানির পাড়ে। বাজার একটা পাবেন ওই সওদাগর পট্টিতে। হপ্তায় হাট বসে দু'দিন। খোল্টা বন্দরে নামলেই বুঝবেন ছোট্ট জায়গা। কয়েকটা সাহেব আর কয়েক ঘর বাবু পাবেন। উকিলও আছে চার-পাঁচ ঘর। শিক্ষক-টিক্ষকও পাবেন। এখন তো ইশকুল হয়েছে। কোর্টের নতুন দালানও হয়েছে। তবে দিনকয়েক থাকতে চাইলে জিনিসপত্র টাউন থেকে নিয়ে যাওয়াই ভাল। ব্যবসার কাজে যাচ্ছেন তো?'

'ওই আর কী!' গোপাল ঘোষ যাওয়ার উদ্দেশ্য খোলসা করতে চাইলেন না।

এসব অবশ্য সাত দিন আগের কথা। গতকাল শেষ বিকেলে গোপাল ঘোষ এবং তাঁর মালপত্র সমেত দু'টি গোরুর গাড়ি কালজানি টপকে পুব পাড়ের দত্তপট্টিতে এসে থেমেছে। আগের দিন কাকভোরে রওনা দিয়েছিলেন গোপাল ঘোষ। পথে পেরিয়েছেন অগুনতি নদী। তারপর আসতে পেরেছেন অরণ্যের মাঝখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকা এই জনপদে।

দত্তপট্টির বেশির ভাগ লোক কাটা কাপড়ের ব্যবসায় জড়িত। হেরম্ব দত্ত অবশ্যি ব্যবসার বাইরে আইন ব্যবসাও করেন। তিনি মোক্তারি পাশ দিয়েছেন। এক বিঘের বেশি জমির উপর দশ ফুট লম্বা লম্বা শাল খুঁটির মাথায় বসানো ইংরেজি 'এল' আকারের কাঠের বাড়ি। দু'দিকে চওড়া বারান্দা। বাড়িতে বউ আর তিনটে ছেলেমেয়ে ছাড়াও জনা চারেক কাজের লোক। গোপাল ঘোষের গাড়ি সে বাড়ির গাছগাছালি ঘেরা উঠোনে ঢুকতেই বাড়িতে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল দক্ষিণের শেষ ঘরটা। গ্যালেস দেওয়া প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরা হেরম্ব দত্তকে মনে হল বেশ আলাপী মানুষ। নইলে প্রথম দিনেই সন্ধে সাতটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত আড্ডা জমে উঠল কেন? পথশ্রমে ঘুম ঘুম পেলেও গোপাল ঘোষ সমান তালে গল্প চালিয়ে গেলেন কীভাবে? শেষে সাড়ে বারোটা নাগাদ নীল কাচে ঘেরা লণ্ঠনের শিখা কমিয়ে গোপাল ঘোষ যখন লেপ মুড়ি দিয়ে শয্যাশায়ী হলেন, তখন টের পেলেন রীতিমতো শীত পড়ে গিয়েছে এখানে। তারপর অখণ্ড নিস্তব্ধতার ফাঁক দিয়ে তাঁর কানে ভেসে আসতে লাগল বিচিত্র সব শব্দ। সে-সব কানে নিতে নিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, টের পাননি।

কাকভোরে ঘুম থেকে উঠে পিছনের বারান্দায় চাদর মুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গোপাল

দত্তপট্টির বেশির ভাগ লোক কাটা কাপড়ের ব্যবসায় জড়িত। হেরম্ব দত্ত অবশ্যি ব্যবসার বাইরে আইন ব্যবসাও করেন। তিনি মোক্তারি পাশ দিয়েছেন। এক বিঘের বেশি জমির উপর দশ ফুট লম্বা লম্বা শাল খুঁটির মাথায় বসানো ইংরেজি 'এল' আকারের কাঠের বাড়ি। দু'দিকে চওড়া বারান্দা। বাড়িতে বউ আর তিনটে ছেলেমেয়ে ছাড়াও জনা চারেক কাজের লোক।

ঘোষ বুঝতে পারলেন এলাকাটা আসলে গাছ আর গাছের ফাঁকে গড়ে ওঠা জনপদ। তার আড়াল থেকে সূর্য উঠলে রোদ্দুর এসে পড়ে বেলা একটু গড়ালে। কনকনে শীতে পরিষ্কার আকাশের নিচে ঘুমিয়ে থাকা গ্রামটা দেখে গোপাল ঘোষের বড় আনন্দ হল। কিন্তু গত রাতেই হেরম্ব ঘোষ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আলিপুরদুয়ার কেমন ভয়ানক জায়গা। 'ব্ল্যাক ফিভার শুনেছেন তো? আলিপুরদুয়ার হল ব্ল্যাক ফিভারের ডিপো।' তিনি জানিয়েছিলেন, 'আর সাপ-বাঘের কথা তো ছেড়েই দিন। রোজ কেউ না কেউ মরছে এসব কারণে। টি গার্ডেন না হলে এসব জায়গায় কেউ আসত না মশাই! তবে হ্যাঁ! এক টাকা দিলেই জমি পেয়ে যাবেন থাকার জন্য। বন্যা-টন্যার তেমন ভয় নেই। বাঘ আর ফিভার বাদ দিলে লাইফ কিন্তু বেশ ইজি। রেল-টেল ঠিকমতো চালু হলে আরও লোক আসবে।'

তারপর বেশ উৎসাহ নিয়ে বলেছিলেন, 'এসে যখন পড়েছেন, তখন কয়েক বিঘা জমি কিনে রেখে যান। একেবারে জলের দর।'

'জমি না। ভাবছি জলপাইগুড়ি ফিরে গিয়ে জমি কিনে আপনার বাড়ির মতো একটা বাড়ি বানাব। কাঠ কিন্তু সলিড পেয়েছেন আপনি। এ জিনিস দেড়শো বছরেও নষ্ট হয় না।'

হেরম্ব দত্তর আদালত ছিল। তিনি দশটা নাগাদ বেরিয়ে গেলেন। মোক্তারি পাশ দিলেও তাঁর ফিজ এখনই এক শিঙে। মোষের শিং ভরতি খুচরো পয়সা দিয়ে উকিলের ফিজ দেয় এখানকার সাধারণ মানুষ। গোপাল ঘোষের আলিপুরদুয়ার আসার কারণ হিসেবে তিনি জেনেছেন হাওয়া বদলানোর পাশাপাশি কাঠের খোঁজখবর করা। অবশ্য সে নিয়ে তাঁর খুব একটা আগ্রহও ছিল না। তিনি গল্প করার একজন পেয়ে আহ্লাদিত হয়েছেন। এখনও রাজনীতির আলাপ শুরু হয়নি। হেরম্ব দত্তর দৃঢ় বিশ্বাস যে গোপাল ঘোষ ইংরেজদের সাপোর্টার।

'যা-ই বলেন দাদা! ব্রিটিশ হল ব্রিটিশ!' গত রাতে বলেছিলেন তিনি কোনও এক প্রসঙ্গে। গোপাল ঘোষ শোনামাত্রই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিয়েছেন। তাঁর এই অভিনয়টাই হেরম্ব দত্তর অনুমানের কারণ।

হেরম্ব দত্ত বেরিয়ে যাওয়ার পর গোপাল ঘোষও পথে নামলেন। বিকেলের পর কোনও এক আড্ডায় নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে গিয়েছেন হেরম্ব দত্ত। সেখানে অভিনয়ের চর্চা হয়। গান্ধিজির আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাব আলিপুরদুয়ারেও বেশ ছড়িয়েছে বলে জেনে এসেছেন গোপাল ঘোষ।

রোদ্দুরটা বেশ আরামের। গোপাল ঘোষ টুকটুক করে হাঁটতে লাগলেন। পথচলতি মানুষরা তাঁকে দেখেই বুঝতে পারছিল বহিরাগত। গোপাল ঘোষও বুঝলেন, আলিপুরদুয়ার জায়গাটা ছোট হলেও খুব ছোট নয়। হরেক জাতি-ধর্মের মানুষ এসে ভিড়ছে এখানে। বেশির ভাগই এসেছে ভাগ্যের অন্বেষণে। সওদাগর পার্টিতে এসে তাঁর মনে হল, সেটা দিনবাজারের ছোট একটা সংস্করণ।

সেখানে একজন যেচে আলাপ করতে এলে গোপাল ঘোষ বেশ খুশি মনেই গল্প জুড়ে দিলেন। এ কথা-সে কথার পর গান্ধির কথা উঠতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি মঘা দেওয়ানিকে চেনেন?'

লোকটির চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস ফুটে উঠল যেন।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

সাপ সাপান্ত

মিন্টুদা বললেন, চলুন গরুমারা যাই। একটা সাপ ছেড়ে আসব বনে।

লোভনীয় প্রস্তাব। না করা যায়? তার ওপর এই সাপ ছাড়বার সময়ের সঙ্গী থাকবেন আমেরিকান প্রকৃতিবিদ ফ্রেড ব্যাগলে। বনকর্তারা তো থাকবেনই। এই বনেই মিন্টুদা কতবার পৌঁছেছেন শঙ্খচূড়ের ডেরায়, ঘন বাঁশবনে। দেখেছেন সতেরো ফুটের কিং কোবরা। আমরা দেখেছি তার নিয়ে আসা সেই সাপের বিশাল খোলস। মিন্টু চৌধুরী আমার কাছে এক বিস্ময়। ছোট্টখাট্টো চেহারার মানুষটি সাপেদের সামনে পড়লে কী অতিকায় হয়ে যান। তাই তাঁর কথা বারবার বলতে ভাল লাগে।

দু হাজার পাঁচের নভেম্বরের শীতমাখা বন তখন কুয়াশামাখা, মোহময়। সবুজে সবুজে শীতের হাওয়ার নাচন।

সাপটাকে কতবার দেখেছি মিন্টুদার বাড়িতে। চোদ্দ মাস আগে আট ফুটের এই ময়াল জলঢাকার ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে ধূপগুড়ির কাছাকাছি চলে এসেছিল। জেলেদের পাতা ফাঁসিজালে আটকে বেচারার মরো-মরো অবস্থা। মিন্টুদা যথারীতি সেটিকে উদ্ধার করে এনে চিকিৎসা শুরু করলেন, দিনের পর দিন। খেতে পারত না অজগরটি। আস্তে আস্তে আবার সে ইঁদুর ধরতে সক্ষম হল।

আমরা পৌঁছলাম বনের গভীরে ইন্ডং নদীর তীরে। কী ভাল লাগছে চারিদিক! ময়ূরের ঝাঁক যেন আমাদের রিসিভ করতে দাঁড়িয়ে। দূরে হলেও স্পষ্ট দুটি গন্ডার। ছুটতে দেখলাম কিছু হরিণ-হরিণী। নদীর স্বচ্ছ জলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পাঁচটি বড় শোলমাছ সুইমিংয়ে মগ্ন!

মিন্টুদা বললেন, ওর খাবারের অভাব হবে না। অনেক মাছ আছে নদীতে।

ঝুড়ি খোলা হল। বেরিয়ে এল অজগর। চিফ কনজার্ভেটর অব ফরেস্ট-এর ডিজিটাল ক্যামেরায় একের পর এক ক্লিক। অবাক চোখেও তাকিয়ে আছেন ব্যাগলে সাহেব। আর, কী মমতায় সাপটিকে ধরে আছেন মিন্টুদা। চোদ্দ মাসের অপত্য স্নেহে কোন ফাঁক ছিল না যে! তাই ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে। ডুয়ার্সের সাপও কি বোঝে সেই ভালবাসা? সেও জড়িয়ে ধরেছে মিন্টুদার হাত।

সাপ ভাসল নদীতে। নদীর জল যেন

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

ছলকে উঠল মিন্টুদার চোখে।

এও তো এক সালেম আলীর গল্প। কিন্তু বিস্তৃত ভুবন খোঁজ নিল না। সেই কবে প্রিয় বন্ধু শঙ্কর সাপের ছোবলে মারা গিয়েছিল। সেই মৃত্যু নাড়িয়ে দিয়েছিল সহপাঠীকে। পরিবারে কেউ সাপুড়ে ছিল না। কিন্তু মিন্টু চৌধুরী বিষাক্ত সাপেদের জয় করবার ব্রত নিয়ে এক দীর্ঘ যাত্রায় নামলেন। ডুয়ার্সের সর্পকূল আর তিনি তো এখন এক পরিবারভুক্ত।

মনে পড়ে সেই গোখরো ধরবার দিনটির কথা। আমার এক সহকর্মীর বৌ ফোন করল। তার স্কুটিতে পেঁচিয়ে রয়েছে এক অতিকায় গোখরো। সেটি নাকি ফুঁসছে।

আমি পাকড়াও করলাম মিন্টুদাকে। ছুটলাম সেই বাড়ি। হাসিমুখে মিন্টুদা সেই ঘরটিতে ঢুকলেন। যেন কিছুই হয়নি!

সাপ তখন মেঝেতে। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য - মিন্টুদা সামনে যেতেই গোখরোটি বিশাল ফণা তুলল। সে ফণা ছোট্ট-খাটো মিন্টুদার গলা অব্দি পৌঁছল। আমরা রুদ্ধশ্বাস চেয়ে। এই বুঝি ছোবল মারে।

কিন্তু বিস্ময় - মিন্টুদা তার ডান হাত বাড়ালেন সাপের মাথার দিকে। সে এক অসামান্য সারেন্ডার! না দেখলে বোঝা কঠিন। তিনি হাত রাখলেন গোখরোর মাথায়। আর সাপটি নিমেষে ধরা দিল তাকে। কোন বেয়াদপি নয়!

ডুয়ার্স ভরসা করে এই মানুষটির ওপর। সাপে সাপে ভরা এই ডুয়ার্স গ্রীষ্ম বর্ষায় আরো সর্পময় হয়ে ওঠে। বিষধর নির্বিষ অসংখ্য সাপ কিলবিল করে এখানে সেখানে। ছানাপোনাও বেরোতে থাকে।

মিন্টুদার ডাক আসতে থাকে সকাল থেকে মধ্যরাত। কত মানুষ যে প্রাণ পেয়েছেন। কত সাপ উদ্ধার করেছেন। তাঁর বাড়িতে বারবার আশ্রয় পেয়েছে পাইথন, গোখরো, কালাচ, কেউটে কালনাগিনী চন্দ্রবোরা-র দল।

হাঁটু অব্দি গামবুট, হাতে স্টিক। তাঁকে দেখলেই ডুয়ার্স চিনে নেয় সাপ উদ্ধারে এসেছেন মানুষটি।

সে গল্পটিও তো এখনো মুখে মুখে ফেরে। বিয়ে করতে যাবার ঠিক আগে এক তরুণকে সাপ কাটল। এবং খুব তাড়াতাড়ি সে নেতিয়ে পড়ল। ডাক্তার জানালেন, মারা গেছে সে। কান্নাকাটি চিৎকার চেঁচামেচি ... একাকার অবস্থা। মিন্টুদার কাছে শেষ ভরসায় নিয়ে আসা হল সেই তরুণকে। তিনি পালস্ দেখলেন। মায়া হল। মুখে চন্দনের প্রলেপ। যেন সদ্য বরটি ঘুমিয়ে আছে। মিন্টুদা তাঁর অভিজ্ঞতায় বুঝলেন - প্রাণ আছে। তিনি নিজস্ব ধরণে চিকিৎসা শুরু করলেন। ঘন্টা বাদে চোখ খুলল ছেলেটি। সে রাতে সে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল।

মনে পড়ে সেই গোখরো ধরবার দিনটির কথা। আমার এক সহকর্মীর বৌ ফোন করল। তার স্কুটিতে পেঁচিয়ে রয়েছে এক অতিকায় গোখরো। সেটি নাকি ফুঁসছে। আমি পাকড়াও করলাম মিন্টুদাকে। ছুটলাম সেই বাড়ি। হাসিমুখে মিন্টুদা সেই ঘরটিতে ঢুকলেন। যেন কিছুই হয়নি! সাপ তখন মেঝেতে। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য - মিন্টুদা সামনে যেতেই গোখরোটি বিশাল ফণা তুলল। সে ফণা ছোট্ট-খাটো মিন্টুদার গলা অব্দি পৌঁছল। আমরা রুদ্ধশ্বাস চেয়ে। এই বুঝি ছোবল মারে।

জানি না কারণ কী! একটি সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ সাপ মারাকে কর্তব্য বলে মনে করেন। ডুয়ার্সে আমি বহুবার দেখেছি। যে কোন সাপ দেখলেই মারবার জন্য তৎপর। মিন্টুদাও কিন্তু সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। এক ব্যতিক্রমী মানুষ।

আমার কর্মস্থলের কাছে এক বিশাল গোখরো (এখানে গোমা সাপ বলে) সকালবেলা আস্তে আস্তে যাচ্ছে। তা দেখে আমার এক সহকর্মী নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে লাঠি নিয়ে তাড়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই নেতিয়ে পড়ল সাপটি। আমি খবর পেতে পেতেই মিন্টুদাকে জানালাম। তিনি এসে দুঃখে ফেটে পড়লেন। কেন মারতে হল? সাপটি তো কোন দোষ করেনি! কী মায়ায় লোকটি ঐ সাপের বাচ্চাগুলোকে গর্ত থেকে ধরে নিয়ে গেলেন। সেগুলোকে যত্নে বড় করে বনে ছেড়ে দেবেন বলে।

স্কুলে স্কুলে ঘুরে বেড়ান ছাত্রছাত্রীদের সাপ নিয়ে জানাতে। আমি তার সঙ্গে এরকম কত শিবিরে গেছি। নির্বিষ সাপ মুঠো ভরে ধরিয়ে দিয়ে বলেন - ধরুন, কিচ্ছু করবে না। একটু কামড়াক্ না। কোন ক্ষতি হবে না!

তার শরীতে কতবার বিষ ঢেলেছে বিষধর। কিন্তু ঝাড়ফুঁক নয়, নিজের চিকিৎসায় বেঁচে গেছেন এই নীলকণ্ঠ।

আমি মনে মনে ভাবি, ডুয়ার্সের সর্পসচেতনতার এই পথিকৃৎকে কি আর একটু কাজে লাগানো যেত না? তার পথ ধরেই এখন অনেকে সাপ নিয়ে কাজ করছেন। মিন্টুদাকে সামনে রেখে এগোলে হয়তো সাপের ছোবলে মৃত্যু যেমন অনেকটা কমে যেত, তেমনি সাপেরাও রক্ষা পেত মানুষের আক্রমণ থেকে।

পথিক বর

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮
কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

আপনি কি 'এখন ডুয়ার্স'-এ লিখতে চান?

আপনিও হতে পারেন 'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রতিবেদক। আপনার এলাকায় কোনও উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা হলে তাই নিয়ে প্রতিবেদন লিখে পাঠাতে পারেন। প্রতিবেদনটি যেন ২৫০ শব্দের মধ্যে হয়। সঙ্গে ছবি দিতে ভুলবেন না। লেখা পাঠান এই ঠিকানায়— **'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে 'এখন ডুয়ার্স', মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১। ই-মেল- srimati.dooars@ gmail.com**

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 5,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

প্রকাশিত হল ‘ডুয়ার্সের হাজার কবিতা’

সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মোড়ক খুলে বেরল ‘ডুয়ার্সের হাজার কবিতা ২০১৬’। একশো চব্বিশজন কবির সহস্রাধিক কবিতায় ধরা পড়েছে ডুয়ার্স নিয়ে তাঁদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা। গত ৭ অগাস্ট, রবিবার, জলপাইগুড়ির মুক্তা ভবনের দোতলায় ‘আড্ডাঘর’-এ নতুন বইটির মোড়ক খুলে দর্শকের সামনে মেলে ধরলেন বিশেষ অতিথি বিধায়ক সুখবিলাস বর্মা মহাশয়। ‘আড্ডাঘর’-এর পুরো হলটিতে সাহিত্যপিপাসুরা উপচে পড়েছিলেন সে দিন। সুখবিলাসবাবু এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে। কবিরা, যাঁদের কবিতা স্থান পেয়েছে এই সংকলনে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের কবিতা পাঠ করে শোনালেন। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধনী বক্তব্যে ‘এখন ডুয়ার্স’-এর ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক অমিত কুমার দে-র ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ‘প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকে সময় বার করে অন্তত‌পক্ষে হাজার চারেক কবিতা থেকে যোগ্য কবিতা বাছাই করার মতো কঠিন কাজটি তিনি যে নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন তা আমাদের

অবাক করেছে।’ অমিত কুমার দে তাঁর নিজের ভাষণের সময়ও অবশ্য সে কথা স্বীকার করেছেন যে, কাজটি সত্যিই সহজ ছিল না। বহু কবিতা থেকে ভালগুলিকে বাছাই করতে গিয়ে চার হাজারেরও বেশি কবিতা পড়তে হয়েছিল তাঁকে। তিনি তাঁর বক্তব্যে ডুয়ার্সের কবিদের নিয়ে এমন একটি সংকলন প্রকাশ করার জন্য প্রদোষ রঞ্জন সাহার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন আন্তরিকভাবে। এমন একটি সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার কথা এর আগে কখনও ভাবা হয়নি। বইয়ের প্রচ্ছদটি এঁকেছেন পরমেশ দাস (পিন্টু)। সকলেই বইটির সুন্দর ছোটখাটো আকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। অনায়াসে সঙ্গে রাখা যাবে, যাতে যে কোনও কবিতার আসরে এটিকে সঙ্গী করা যায়। রঙ্গন রায় ও সুপ্রিয় চন্দ— দুই কলেজ ছাত্র সুন্দরভাবে শেষের দিকে সঞ্চালনার কাজটি করেন, যা উল্লেখ করার মতো।

সে দিন যাঁরা ‘আড্ডাঘর’-এ উপস্থিত ছিলেন, চা-বিস্কুটসহ একটি ঘরোয়া পরিবেশ পেয়ে সকলেই বেশ খুশি। কঠিন বাঁধনে বাঁধা কোনও অনুষ্ঠান নয়। একে অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন, শুধু তা-ই নয়, অপরিচিতদের মধ্যেও পরিচিতি ঘটল। সব মিলিয়ে ঝকঝকে এবং সাবলীল গতিতে এগিয়ে যাওয়া অনুষ্ঠানটির কথা অনেকদিন পর্যন্ত মনে রাখবেন সবাই।

শ্বেতা সরখেল

উন্নয়নের পথে মানুষের সাথে

সদ্য শেষ হল তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত 'উন্নয়নের পথে মানুষের সাথে' নামাঙ্কিত বিশেষ অনুষ্ঠান। কোচবিহার জেলার রবীন্দ্রভবনে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন ও বিধায়ক মিহির গোস্বামী। তিন দিন ধরে চলা এই অনুষ্ঠানে নামীদামি সংগীতশিল্পীদের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা থেকে আগত লোকশিল্পীরা তাঁদের সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এখানে বিভিন্ন জেলার হস্তশিল্পী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের তৈরি নানান সামগ্রীর প্রদর্শনী ও বিক্রয়েরও ব্যবস্থা ছিল।

নিজস্ব প্রতিনিধি

সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আলিপুরদুয়ার সিটিজেন'স ফোরাম-এর উদ্যোগে আলিপুরদুয়ারের নবনির্বাচিত বিধায়ক ড. সৌরভ চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চ এ দিন কানায় কানায় ভরতি হয়ে যায়। কোনও রাজনৈতিক নেতা-কর্মী নয়— শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকর্মী, চিকিৎসক, আইনজীবী, ক্রীড়াজগতের প্রচুর মানুষ এ দিন হাজির হন পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে। লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এ দিনের অনুষ্ঠান। এর পর একে একে অনুষ্ঠান করে সকলের মন জয় করে নেন— দেবজয়া সরকার, ঊর্মি রায়, দীপিকা রায়, সুপ্রতা সিংহ, ভাস্কর চৌধুরি, অমল চট্টোপাধ্যায়, অনুমাধব সরকার।

এ ছাড়া শহরের প্রায় ৮টি নৃত্যশিক্ষাকেন্দ্রের অনুষ্ঠানও ছিল দেখার মতো। বিধায়ক তাঁর ভাষণে বলেন, 'নির্বাচনের আগে যখন দেখলাম, আপনারা আমার পাশে আছেন, তখনই ভেবে নিয়েছিলাম আমার জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। যার সঙ্গে অরাজনৈতিক এত মানুষ থাকবে, তার সফলতা আসবেই। এবার তা প্রমাণিত হয়েছে। আপনাদের উপহার তো দিতেই হবে। আলিপুরদুয়ার পুর জল সংস্কার হচ্ছে, রবীন্দ্রভবনের কাজও শুরুর পথে, আধুনিক সুইমিং পুলও নির্মাণ হচ্ছে শহরে।' করতালিতে ফেটে পড়ে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ। প্রত্যেকের মুখে একটাই কথা— এই সরকার শুধু ঘোষণা করে বসে থাকে না, কাজটাও করে। আমরা আশাবাদী।

আলিপুরদুয়ারে রবীন্দ্র তিরোধান দিবস

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর-সহ বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও জেলার বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নৃত্য, আবৃত্তি ও সংগীত বিদ্যালয় পালন করল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৬তম তিরোধান দিবস। এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য, আলিপুরদুয়ারের এই প্রজন্মের মেয়ে ঊর্মি রায় সম্পূর্ণ একার উদ্যোগে পালন করল একটি বেসরকারি ভবনে রবীন্দ্র তিরোধান দিবস। অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভবন দর্শক ও শহরের বিশিষ্টজন ও শিল্পীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। ডুয়ার্সের বিশিষ্ট চা গবেষক রাম অবতার শর্মার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অর্ণব সেন, তমোনাশ দে সরকার, প্রমোদ নাথ, বেণু সরকার। উদ্‌বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন 'লৌকিক'-এর শিল্পীরা। এর পর সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তিতে অংশ নেন যথাক্রমে— অমৃতা শর্মা, গার্গী দত্ত, বিপাশা কাজী, অদ্রিজা সরকার, শুভম সাহা, মেঘনা অধিকারী, সঙ্গীতা সরকার, বেণু সরকার, ভাস্কর চৌধুরী, ঋতম চক্রবর্তী-সহ বহু বিশিষ্ট শিল্পী। অনুষ্ঠান শেষে অনেকের মুখে শোনা গেল, এরকম একটি অনুষ্ঠান একা একটি মেয়ে কীভাবে সম্পূর্ণ করল? ভাবা যায় না। ঊর্মি জানান, 'আমাদের সংস্থা লৌকিক-এর প্রমোদ নাথ ও গোপাল রায় সব সময়ই আমার পাশে ছিলেন বলে অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ করতে পারলাম। এ ছাড়া শহরের প্রত্যেক শিল্পী আমাকে সহযোগিতা করেছেন। প্রতি বছর এই দিনটি আমি পালন করবার চেষ্টা করব।' সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পাপিয়া সরকার।

পরিতোষ সাহা

একই মঞ্চে দুই বিধায়ক সৌর;ভ চক্রবর্তী ও মনোজ টিগ্গা

নিক্কণ-এর নাচ

জলপাইগুড়ির প্রসিদ্ধ নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিক্কণ-এর ২৭তম জন্মদিন পালিত হল ২৯ জুলাই স্থানীয় কলাকেন্দ্রে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শুভেন্দু বিশ্বাস এবং প্রণীতা বিশ্বাসের পরিচালনায় ১৭৫ জন ছাত্রী সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে শাস্ত্রীয় থেকে লঘু— সব ধরনের নৃত্যকলার নমুনা পেশ করেছেন। শুক্রবার উজান নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একটি অণুনাটিকা পরিবেশিত হয়। আবহাওয়া প্রতিকূল সত্ত্বেও প্রায় আটশো দর্শক রাত দশটা অবধি অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন ওই দিন।

গল্পের আসর

গত ২৩ জুলাই জলপাইগুড়িতে 'এখন ডুয়ার্স'-এর 'আড্ডাঘর'-এ বসেছিল 'টেবিল ঘিরে গল্পপাঠ'-এর আসর। নবীন-প্রবীণ গল্পকাররা স্বরচিত গল্পপাঠের পাশাপাশি আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন। গল্প পড়েছেন অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, তনুশ্রী পাল, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, শ্বেতা সরখেল, শাঁওলী দে, তপতী বাগচী, হিমি রায় এবং উইনি রায়। জানা গিয়েছে যে, পরের আসর বসছে ২০ অগাস্ট, 'আড্ডাঘর'-এই।

সংগীত অ্যাকাডেমির শাস্ত্রীয় সন্ধ্যা

গত ২৪ জুন জলপাইগুড়িবাসী সাক্ষী হয়ে রইল এক অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক ও শাস্ত্রীয় সন্ধ্যার। পশ্চিমবঙ্গ সংগীত অ্যাকাডেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ দ্বারা আয়োজিত এই সন্ধ্যা

ছিল মুগ্ধতার গীতিমালা। সংগীত, তবলা এবং নৃত্যের সুর, তাল আর ছন্দে ভরে উঠেছিল রবিবাসরীয় সন্ধ্যা।

সংবর্ধনা এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। সঞ্চালক মানস ভৌমিকের কণ্ঠ স্বাগত জানাল দীপান্বিতা দেবনাথকে। তাঁর 'সেমিক্লাসিক্যাল' গানে তিনি অনায়াসে প্রমাণ করলেন, তিনি গিরিজা দেবীর সুযোগ্যা শিষ্যা। চারবার রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত দীপান্বিতা শুরুতেই প্রেক্ষাগৃহ জমজমাট করে তুললেন। তাঁকে সংগত করলেন দেবাশিস অধিকারী। এর পর শর্মিলা চক্রবর্তী, আকাশবাণীর নিয়মিত সংগীতশিল্পী, তবলায় দেবাশিস অধিকারী ও সারেঙ্গিতে কমলেশ মিশ্রকে নিয়ে দর্শকদের আকৃষ্ট করলেন। সুজিত সাহা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফারুগাবাদ ঘরানার তবলাশিল্পী তাঁর 'ত্রিতাল' এবং 'রেলা'র মাধ্যমে তালের এক মায়াজালে শ্রোতাদের বেঁধে

ফেলেছিলেন। জলপাইগুড়ির রাউত বাড়ির মেয়ে বিদুষী ডালিয়া রাউত অনুষ্ঠানে নতুন মাত্রা আনলেন। বেনারস ঘরানার অসামান্য গায়কির মাধ্যমে প্রথমে ঠুংরি এবং একে একে পাঞ্জাবি, টপ্পা ও দাদরা শোনালেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বটি ছিল একেবারে অন্য স্বাদের। শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় ও আপ্লুত হবার অপেক্ষায়। অসীমবন্ধু ভট্টাচার্যর সে এক অসামান্য কত্থক নৃত্যের পরিবেশনা। 'শিবস্তুতি' দিয়ে শুরু করে 'পরণ', 'চক্কর'সহ কত্থকের বিভিন্ন বোল-বাণী মাতিয়ে দিয়েছিল দর্শকদের। প্রেক্ষাগৃহে জমাট বাঁধা নৈঃশব্দ্য। অসীমবন্ধু ভট্টাচার্য বারবার উল্লেখ করলেন জলপাইগুড়ির সঙ্গে তাঁর নাড়ির টানের কথা, ভালবাসার কথা। বিদুষী ডালিয়া রাউতও জলপাইগুড়ির মেয়ে। ফলে জলপাইগুড়ি যে এখন সংস্কৃতির পীঠস্থান, সে কথা অনস্বীকার্য।

গ্রন্থন সেনগুপ্ত

রাজ্য স্কুল হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ

কলকাতায় অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স আপ হল কোচবিহার জেলা দল। অনূর্ধ্ব-১৪ এই রাজ্য হ্যান্ডবল খেলার আয়োজক ছিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস। কোচবিহার থেকে দু'জন কোচ ও দু'জন ম্যানেজারসহ ২৪ জনের একটি দল এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। বেহালা পর্ণশ্রী বিদ্যামন্দিরের মাঠে কোয়ার্টার ফাইনালে কোচবিহার জেলার মেয়েদের দল উত্তর ২৪ পরগনার কাছে হেরে যায়। কোচবিহার ছেলেদের দল প্রথম রাউন্ডে ১৫-১৩ গোলে জলপাইগুড়ি জেলা দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। এর পর নদিয়াকে ১৪-৫ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠলেও বাঁকুড়া জেলা দলের কাছে ১১-২০ গোলে হেরে কোচবিহার ছেলেদের দল রানার্স হয়। কোচ কপিল দাস বলেন, এবারের খেলায় তাঁদের দল জিততে পারেনি ঠিকই, কিন্তু ছেলেমেয়েরা খেলায় সকলের নজর কেড়েছে। রাজ্য হ্যান্ডবল দলে খেলার জন্য কোচবিহার জেলা দলের ৪ জন ছেলে ও ২ জন মেয়ে কলকাতায় সিলেকশন ট্রায়ালে ডাক পেয়েছে বলে জানান তিনি।

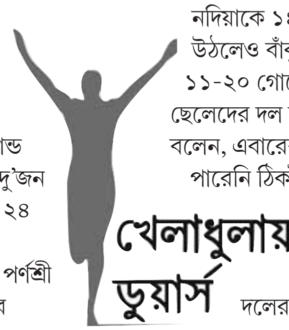

নিজস্ব প্রতিনিধি

১৮তম স্বাধীনতা কাপ ফুটবল

আলিপুরদুয়ার ফুটবলপ্রেমী দর্শকদের চোখে জেলার সেরা ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে আগামী ১৮ অগাস্ট ২০১৬। আশুতোষ ক্লাব (ত্রিশাখা)-এর উদ্যোগে ১৮তম স্বাধীনতা কাপ রানিং নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে শহরের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। প্রচুর দর্শক উপস্থিত থাকায় ফুটবল দলগুলো অধীর আগ্রহে বসে থাকে এই টুর্নামেন্টের জন্য।

এ বছর ৮টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে— দলগা বীরপাড়ার জুবিলি ক্লাব, কোচবিহারের কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র, কালচিনির এসএকে, মারাখাগর দৈমালু ক্লাব, সকার ইলেভেন আলিপুরদুয়ার, আসামের বঙ্গাইগাঁও ১১ ও আশুতোষ ক্লাব আলিপুরদুয়ার।

আয়োজক সংস্থার পক্ষে শুভ্রদীপ দাস ও শ্যামল দত্ত জানালেন, 'যে মাঠে খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হবে, সেই মাঠ এই মুহূর্তে জলের তলে। বৃষ্টি কমার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাঠটিকে খেলার উপযুক্ত করে তোলবার ব্যবস্থা করছি।'

পরিতোষ সাহা

বই পত্রের ডুয়ার্স

অবতামসী: সময়ের নিরিখে ভিন্নধর্মী উপন্যাস

বাংলা সাহিত্যের ভূকম্পনকেন্দ্র থেকে দূরে বসে ১৯৫৬-৫৭ সালে সুরজিৎ বসু (১৯২৯-৮৩) তাঁর 'অবতামসী' উপন্যাসের খসড়া করেছিলেন। ১৯৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত এ উপন্যাসটি খুব বেশি হাতে পড়েনি। ২০১৫ সালে উপন্যাসটি পুনঃপ্রকাশিত হয়।

আলোক নামে একটি যুবকের উক্তিতে, ভাবনায়, চেতনাপ্রবাহ রীতিতে উপন্যাসের সব ঘটনা, বিবরণ আমরা শুনতে পেরেছি, জেনেছি দ্রুত পরিবর্তন হতে যাওয়া সময় ও সমাজের এক দিশেহারা, সর্বগ প্রতিনিধি এই আলোক, যে প্রথমেই জানিয়েছে, সে কাউকে ভয় পায় না। এই আলোক, যে বলেছিল, সে বরফ-ঠান্ডা পাহাড়ি নদী পেরোতেও রাজি, শুধু একবারই। এক মুহূর্তের জন্যে ভয় পেয়েছিল, যখন তার বড় মাসির ছেলে আচারে-ব্যবহারে, পড়াশোনায় ভাল, সদ্য যৌবনে পা দেওয়া বাবলু আত্মহত্যা করেছিল। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন এই আলোক জীবনের কাছে কিছু দাবি করেনি। বলত, 'উচ্চাশা লালসারই নামান্তর,' 'অন্যের মাথা ছাড়িয়ে উঠবার ইচ্ছেটার মধ্যেই একটা ক্লেদাক্ত হ্যাংলামো রয়েছে।' (পৃঃ- ২৪)

সে এক সময়ে কার্টুন আঁকত, কমার্শিয়াল আর্টের কাজকর্ম করত। মাড়োয়ারির সঙ্গে ব্যবসা করত। তার কথাবার্তা ছিল অসংগতিতে ভরা, বিভ্রান্তিকর। একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েও সে বলেছিল, সে বাঁচতে চায়, যে মুহূর্তটা বেঁচে আছে, খুশিমতো তাকে উপভোগ করতে চায়, মৃত্যু-বাঁচা কাউকেই সে আমল দেয় না। সে বলেছিল, জীবনের প্রতিটি বাধা পার হয়েও বেঁচে থাকতে হয়। অন্যের বিপদে দিশেহারা হয়ে দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত আলোক। তার অস্ত্যর্থক জীবনবোধেরই পরিচয় দিচ্ছে এই ভাবনাক্রিয়াগুলো।

সুরজিৎ বসুর লেখা থেকে উঠে এসেছে, ছেলেবেলায় আলোক একটু অনুভূতিপ্রবণ ছিল। আলোকের মনে হত, প্রত্যেকটা মানুষ কীটের মতো। সবকিছু সে সম্পূর্ণ করে দেখতে চাইত। 'অলাতচক্রের গতিশীল উন্মাদনা' চাইত সে। তার কথায়, তার 'হোমের আগুনে' ইয়ত্তার বাইরে নারী মাংসের আহুতি পড়েছিল। কিন্তু কোনও নারীই তাকে শান্তি দিতে পারেনি। এ নয় যে নারীসম্পর্কে তার করুণা বা টান ছিল না। মায়াকে সে রাস্তা থেকেই এনেছিল, তবে ভালবাসতে পারেনি। মায়ার মৃত্যুর পরই সে মিসেস রমা চৌধুরির সঙ্গে বিকেলের দূর ট্রিপে গিয়েছিল। ছোট মাসির মেয়ে উমাকে অবশ্য যৌবনের সমস্ত সারল্য দিয়ে ভালবেসেছিল। ছবি না-আঁকা, চিত্র সমালোচক, চিত্রপ্রদর্শনীর নিয়মিত উদ্‌বোধক মিসেস রমা চৌধুরীর ঔজ্জ্বল্যে সে মুগ্ধ হয়েছিল। মায়ার সঙ্গে যেমন উদাসীন আচরণই করুক, মেয়েদের জন্যে তার সহানুভূতি ছিল।

'হাঁস-মুরগির ডিম ফোটাবার যন্ত্র যেমন ইনকুবিটর, আমাদের দেশে মানুষ স্ত্রীকে তেমনি যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করে, কিন্তু যন্ত্রের কাজটুকু করিয়ে নিয়েই তাকে রেহাই দেয় না।'— বলেছিল আলোক (পৃঃ- ২৯)। শ্লেষের সঙ্গে সে বলেছে, 'নারীর মুক্তি নিয়ে গলা ফাটাতে পুরুষদের উৎসাহই বেশি। পুরুষ নারীকে দাবিয়ে রেখেছে, কিন্তু তাদের মুক্তির চেষ্টা পুরুষদের মধ্যেই দেখা যায় প্রথম, নিজের স্ত্রীকে কোনও স্বামীই সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় চলতে দিতে চায় না। নিজের ঘরের নারীটি বাদে আর সমস্ত নারীসমাজের প্রগতিতেই পুরুষের সমর্থন আছে।' (পৃঃ- ৭৩) পুরুষ যে নারীকে কতটা দাবিয়ে রাখে, তার নজির আলোক এভাবেই দিয়েছে: বারবার সন্তানের জন্য আটকাতে উমার স্বামী নিজে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিষেধক না নিয়ে তা নিতে বাধ্য করেছিল দুর্বল উমাকে। তার বড়দিও তার জামাইবাবুর লাথি মেনে নিত। জানিয়েছে, ভারতবর্ষের মেয়েদের আনুগত্যের, সমর্পণের দীনতা তাকে পীড়া দিত। আলোকের ভাবনার প্রকাশের মধ্য দিয়ে যেন বা লেখকেরই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। এ কথাগুলো এ দেশে মেয়েদের স্থান যে বরাবরই খারাপ ছিল তা পুনরায় মনে করিয়ে দিচ্ছে। আশ্চর্য! মেয়েদের প্রতি করুণাশীল আলোক কাউকেই ভালবাসতে পারেনি। সে উচ্চমন্যতা থেকে ভুগত। প্রত্যেককে তার মনে হত স্লেভ। অস্তিত্ববাদীদের মতো সে মনে করত, জীবন নিরর্থক প্রচেষ্টামাত্র। তাকে মায়া বলত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী। উমা বলত ট্যালেন্টেড। বন্ধুরা বলত এক্সেপশনাল ইন্টেলেক্ট। নিজেকে নিয়ে অনেক কথা বলেছে আলোক। সে মনে করত, তার জন্মের কোনও উদ্দেশ্যই নেই। কাউকে যেমন সে ভালবাসত না, তেমনি ঘৃণাও করত না কাউকে। নিজেরই মুদ্রাদোষে সে একা 'নির্বান্ধব'। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল সে। রেডিয়ো, ফোন ফেলে দিয়েছিল, বাড়ির ত্রিসীমানায় খবরের কাগজ ঢুকতে দেয়নি। নিজের স্বাতন্ত্র্যে, একাকিত্বে সুখী ছিল সে। তার একাকিত্বই তার বিচ্ছিন্নতার কারণ। 'কেহ একা থাকিও'— বঙ্কিমের এই পরামর্শের কোনও মূল্য ছিল না তার কাছে।

ইউরোপীয় অস্তিবাদী উপন্যাসের প্রভাব অনুভব করি 'অবতামসী'তে। বাবার মৃত্যুতে 'অবতামসী'র কথক আলোক কাঁদেনি। যেমন মা-র মৃত্যুতে কাঁদেনি 'দি আউটসাইডার'-এর ম্যরসো। দু'জনই উদাসীন। মনে পড়ে, ওই উপন্যাসের এই উন্মোচক বাক্যগুলো: Mother died today. Or may be yesterday. I don't know.

আধুনিক বাংলা ও ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে সুরজিৎ বসুর পরিচয়ের প্রতিফলন পাচ্ছি 'অবতামসী'তে। উপন্যাসের এক জায়গায় জনৈক ব্যক্তির মৃত্যুর প্রসঙ্গে সুরজিৎ বসু লিখেছিলেন, 'মানুষটার মা ছিল, বাবা ছিল, হয়ত প্রিয়াও ছিল। যদি বিয়ে করে থাকে, তবে ওই দিনে কত উৎসব হয়েছিল ওকে কেন্দ্র করে।... সেই লোকটা কী প্রচণ্ড কৌতুকে শুয়ে আছে ভিজে ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে রাস্তায়।' (পৃঃ- ৫২) এই অংশটুকু মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দর 'আট বছর আগে' কবিতার কিছু অংশ। সুরজিৎ বসু এক জায়গায় লিখেছেন 'প্রগাঢ় বেদনা'। জীবনানন্দ 'আট বছর আগে'তে লিখেছিলেন 'গাঢ় বেদনার'।

এলিয়টের 'দ্য লাভ সং অব জে আলফ্রেড প্রুফ্রক'-এ এরকম দু'টি পঙ্‌ক্তি পাচ্ছি: 'When the evening is spread out against the sky like a patient etherised upon a table.'

'অবতামসী'তে এরকম একটি বাক্য আছে: 'সমস্ত শহর অপারেশন টেবিলে ক্লোরোফর্ম করা রোগীর মতো অচেতন।' (পৃঃ- ৫২) 'অবতামসী'তে কোনও গোষ্ঠীর নয়, একক ব্যক্তির মানসিক সংকট ও চিন্তার জটিলতা দেখানো হয়েছে। 'অবতামসী' স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস। 'অবতামসী'কে রব-গ্রিইয়ে কথিত 'নব উপন্যাস' বলা যেতে পারে। তখন অব্দি লিখিত এ ধরনের বাংলা উপন্যাসের কথা আমাদের জানা নেই।

সুভাষ কর্মকার

অবতামসী, সুরজিৎ বসু, তিতাস, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা- ৬

অরণ্য মিত্র

শরীরকে মূলধন করে ‘নীল’ জগতে নেমে পড়া মনামিকে কিছু কৌশল শিখিয়েছে সুষমা। আত্মরক্ষার কৌশল। সে কৌশল কি এবার কাজে লাগবে মনামির? যুবনেতা নবেন্দু মল্লিকের ‘কন্যাসাথি’র দপ্তরে গমন এবং রমণ কি সার্থক হচ্ছে অবশেষে? ওদিকে আবার নীল জগতের কারবারি নবীন রাই বন্দুকের ধমক থেকে রক্ষা পেয়ে প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে আবার সক্রিয় হচ্ছেন রঞ্জিতের প্ল্যানমাফিক। কিন্তু শিলিগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের সামনে তিনি কাকে দেখে অবাক হলেন? সবুজ আর রোমান্টিক ডুয়ার্সের সমান্তরাল এ এক বাস্তব এবং রুক্ষ জগতের গল্প।

৪৬

বেঁটেমতো লোকটা সোফায় বসে হুইস্কি খাচ্ছে আধ ঘণ্টা ধরে। উলটো দিকে একটা পেল্লায় খাট। তাতে শরীর ডুবে যাওয়া গদি। মনামি বসে ছিল খাটের একটা কোনায়। বেঁটে লোকটা তার আজ সন্ধের ক্লায়েন্ট। রাত দশটার মধ্যে ছেড়ে দেবে মনামিকে। বেঁটে লোকটা নিজের নাম বলেছে ডি দত্ত। যে ফ্ল্যাটে মনামি এসেছে, সেটা যথেষ্ট দামি। বোঝাই যাচ্ছে যে দত্তবাবুর টাকার অভাব নেই। দশ আঙুলে সাতটা সোনার আংটি। খালি গায়ে একটা বারমুডা পরে বসে ছিলেন তিনি। গলায় ভারী সোনার চেনটা রোমশ বুকের উপর মাঝে মাঝেই দুলছিল। চোখ দুটো হায়নার মতো লোকটার। একটু ভুঁড়িও আছে। গায়ের রং কালোর দিকে।

মনামি সতর্ক হয়ে বসে ছিল। এই ধরনের ক্লায়েন্টরা হিংস্রতা ভালবাসে। সংগমের চাইতে ছিঁড়ে খাওয়ায় বেশি আগ্রহী হয়। পশুতে পরিণত হওয়ার আগেই এদের স্খলন ঘটিয়ে দেওয়া দরকার। একটাই বাঁচোয়া যে, এরা বেশিক্ষণ বীর্য দমন করে রাখতে পারে না, আর তারপরেই হেদিয়ে যায়। হুইস্কি খেতে খেতে লোকটির চোখ-মুখ যে বদলে যাচ্ছিল, সেটাও বেশ বুঝতে পেরেছে মনামি। ক্লায়েন্টের দাবি মেনে সে শাড়ি পরে এসেছে। ব্লাউজটা সামনে আর পিছনে অনেকটাই খোলা। শাড়িটা রেখেছে নাভির যতটা সম্ভব নিচে। অবশ্য আসার সময় গায়ে একটা উলের কার্ডিগান চাপিয়ে নিয়েছিল। এখন সেটা খুলে রেখেছে।

‘কী বডি বানিয়েছ খুকুসোনা!’ লোকটা ঘড়ঘড়ে গলায় বলল এবার।

মনামি আলতো হেসে সামান্য ঝাঁকুনি দিল কাঁধে। আঁচলটা গড়িয়ে পড়ল কোলের উপর।

‘ই শালা!’ এবার সোফা থেকে কিঞ্চিৎ টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল ক্লায়েন্ট। মনামির সামনে হাঁটু গেড়ে বসার অগে বারমুডাটা নামিয়ে দিল কোমর থেকে। লাল টুকটুকে একটা ব্রিফ কেবল কোমরে। মনামি পলকে ব্রিফের সামনেটা দেখে আঁচ করে নিল ক্লায়েন্টের উত্তেজনা।

‘এত ভাল ব্লাউজ। এটা তুমি নিজেই খোলো খুকুসোনা!’

মনামি দ্বিরুক্তি না করে ব্লাউজটা খুলে ব্রেসিয়ারটাও খুলতে চাইল। কিন্তু ক্লায়েন্ট তাকে থামিয়ে দিয়ে একটা জান্তব হাসি হেসে বলল, ‘নো নো। স্টেপ বাই স্টেপ।’

ব্রেসিয়ার প্রায় স্বচ্ছ। ক্লায়েন্ট ডান হাতের তর্জনী মনামির বুকের খাঁজে রেখে একটু চাপ দিয়ে বলল, ‘হাউ সফ্‌ট খুকুসোনা!’ তারপর তর্জনীটা বুলিয়ে দিতে লাগল গলা থেকে নাভি অবধি প্রতিটি অংশে। মনামি বুঝতে পারল, যে কোনও মুহূর্তে হিংস্র জন্তুর মতো আক্রমণ করবে লোকটা। তার অনুমান ভুল ছিল না। মিনিট দুয়েক পর আচমকা প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় মনামিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উন্মত্তের মতো চুমু

খেতে শুরু করল সে। কয়েক সেকেন্ড পর মনামি টের পেল, চুমু নয়, শরীরের অনাবৃত অংশে দাঁত আর নখ বসিয়ে দিচ্ছে তার ক্লায়েন্ট। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে গিয়েও দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলাল মনামি। আর্তনাদ শুনলে আরও হিংস্র হয়ে উঠবে এই পশু। মিনিট দুয়েক কোনওরকমে সহ্য করে হঠাৎ এক ঝটকায় লোকটাকে বিছানায় চিৎ করে দিয়ে ছিটকে খাট থেকে নেমে পড়ল সে।

ক্লায়েন্ট একটু অবাক হয়ে রাগে ফেটে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু মনামি অদ্ভুত লাস্যে ক্লায়েন্টকে বিস্মিত করে বলে উঠল, 'নাইস ডার্লিং! এইরকম পুরুষ আমি লাইক করি। আমায় কেউ ছিঁড়ে খেলে আমার অর্গাজম হয়।'

'ল্যাংটো হ মাগি!' লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তোকে আজ পিষে ফেলব!'

'তোমার মতো পুরুষের জন্য আমার একটা সারপ্রাইজ গিফ্‌ট আছে ডার্লিং।'

'গিফ্‌ট?' লোকটা যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল এবার, 'কী বলতে চাস?'

'অরিজিন্যাল শিলাজিত আর তক্ষকের চর্বি দিয়ে তৈরি ভায়াগ্রা। মেড ইন চায়না। আমি চাই তুমি সারারাত ধরে আমাকে খাও।' ব্রেসিয়ারটা আলতোভাবে খুলে মনামি আঁচলটা জড়িয়ে নিল বুকের উপর দিয়ে কোমরে। তাকে তখন দেখাচ্ছিল অপ্সরার মতো। হ্যান্ডব্যাগটা তুলে দুটো ছোট্ট শিশি বার করল সে।

'এই যে ডার্লিং! একটা তোমার মতো পুরুষের জন্য। আর-একটা আমি খাব। তারপর জাস্ট ফিফটিন মিনিট। ব্রিফটা যদি না খোলো, তবে ছিঁড়ে যাবে তখন।'

একটা শিশি থেকে ছোট্ট একটা বড়ি নিজের মুখে ফেলে দ্বিতীয় বোতলটা ছুড়ে দিল ক্লায়েন্টের দিকে। মনামির দিকে একবার তাকিয়ে বার করল একটা বড়ি।

'জাস্ট জিবের নিচে রাখো ডিয়ার।'

লোকটা তা-ই করল। মনামি এবার শরীরে হিন্দোল তুলে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ল আধশোয়া ক্লায়েন্টের উপর। আঁচলটা ফেলে দিয়ে হিসহিস করে বলল, 'লেট মি টেস্ট ইউ ডার্লিং। তারপর তুমি আমাকে গোটা রাত ধরে পিষবে।'

বলতে বলতে ক্লায়েন্টের বুকে নিজের বুক চেপে ধরে মনামি তার চুলে বিলি কাটতে শুরু করল। লোকটা ঘড়ঘড় করতে শুরু করেছে। নিজেকে সামলাতে পারছে না। মিনিট পাঁচেক পর মনামিকে বিছানায় চিৎ করে দিয়ে সে বিছানার উপর দাঁড়াল। ব্রিফটা কোমর থেকে নামিয়ে একবার অদ্ভুত চোখে তাকাল পড়ে থাকা নারী শরীরটার দিকে। তারপর ধপ করে বসে পড়ল।

'কী হল ডার্লিং? ডু আই স্টার্ট ব্লোজব?'

লোকটা বোধহয় 'হ্যাঁ' বলতেই চাইছিল। কিন্তু পারল না। নিস্তেজ হয়ে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মনামি শুনল লোকটার নাক ডাকতে শুরু করেছে।

এর পর লোকটির অলংকার, সোফায় পড়ে থাকা পার্স ভরতি টাকা ও ওষুধের শিশি দুটো ব্যাগে ভরে, বেশভূষা ঠিক করে, গায়ে কার্ডিগান চাপিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বার হতে মনামির সময় লাগল মোটে কুড়ি মিনিট। ক্লায়েন্ট পয়সা দিয়ে শরীর কিনছে, কিন্তু যদি আঁচড়ে-কামড়ে খেতে চায়, তবে এটাই হল শাস্তি। ভায়াগ্রার বদলে আসলে সে খেয়েছে একটা চমৎকার ঘুমের বড়ি। আর মনামি খেয়েছে শুগার ফ্রি বড়ি একটা। তার এই ফ্ল্যাটে যাওয়া-আসার প্রমাণ ধরা থাকবে সিসি ক্যামেরায়। কিন্তু ক্লায়েন্ট চেপে যাবে। তার বউ-বাচ্চা আছে।

অটোতে উঠতেই টুং শব্দে একটা বার্তা এল মোবাইলে। সংক্ষিপ্ত। 'পরশু ঋষিকামের কাজ শুরু হচ্ছে।'

৪৭

ধূমপানের পরিমাণ বড্ড বেড়ে গিয়েছে নবেন্দু মল্লিকের। রোজ তিন-চারশো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে লম্বা সিগারেটের পিছনে। এখন তাঁর অ্যান্টি চেম্বারে ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হয়ে সফি বসে আছে। আধ ডজন গন্ধওয়ালা কন্ডোমের প্যাকেট এসে গিয়েছে সকালে। সফরও সকালে আসার কথা ছিল। কিন্তু এল একটু আগে প্রায় এগারোটা নাগাদ। ফলে আলাপ করতে আসা পঞ্চায়েতের এক প্রধানকে নবেন্দু মল্লিক বলেছেন, একটু বাইরে বসতে। এক মাস আগে হলেই প্রধানের আগমনে গদগদ হয়ে যেতেন তিনি। পৌষ মাস জীবনকে বদলে দেয় বেমালুম!

সফি অবশ্য বুঝতে পারছে না ডাকার কারণটা ঠিক কী। আজ মৌলানির হাট। শীতকালে তার উত্থান তৈল আর বীজবটিকার বিক্রি বেড়ে যায়। ফাল্গুন-চৈত্রে তো কথাই নেই। নবেন্দু মল্লিক তাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলে বেঁচে যায়।

'বুঝলে সফি। বাজারে যে তেল তুমি বেচো, সেটাই কি একমাত্র তেল? নাকি স্পেশাল কিছু আছে?'

সফি এবার গন্ধ পেয়ে নড়েচড়ে বসে। বলে, 'ইস্পেশালের দাম আর কয়জন দিতে পারে কন? এই ধরেন পঁচিশ গ্রাম ইস্পেশাল তেলের জন্য লাগে চারশো টাকা। আর যদি হাই পাওয়ারের বীজবটিকা লাগে, তবে পাঁচশো।'

'কাজ কেমন করে?'

'চার ফোঁটা করে দশ মিনিট পরপর লাগাবেন। আধ ঘণ্টায় তিনবার। তারপর গরম দুধ খাবেন বীজবটিকা দিয়ে এক গ্লাস। এক ঘণ্টার মাথায় দেখবেন এমন শক্ত হইসে যে ঢংঢং কইরা ঘণ্টা বাজানো যাবে। লাগবে নাকি আপনার কোনও বন্ধুর?'

'হ্যাঁ, মানে বলছিল একজন। তা তোমাকে তো চেনেন না। টাকাপয়সা কত লাগবে জানতে চাইছিল।'

'দুইটা মিলে নয়শো হয়। আপনার বন্ধু হইলে পঞ্চাশ টাকা কম দিয়েন। তবে তেল কিন্তু চব্বিশ ফোঁটা। দুইবারের বেশি হবে না। একটা বীজবটিকা এক্সট্রা নিলে কাজে লাগবে। সে না হয় আপনি তেরোশো দিয়েন। বন্ধু টের পাবে কী জিনিস দিসি।'

'বিকেলে দিতে পারবে?'

'সন্ধ্যায় হাট সাইরা দিয়া যাই? একটু রোদ খাওয়ানোর দরকার আসে।'

নবেন্দু মল্লিক আড়াই হাজার টাকা বার করে সফির হাতে দিয়ে বললেন, 'চার দিনের চাই।'

সফির আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে গেল। তেল আর বড়ি যে নবেন্দু মল্লিকই কাজে লাগাবে, সেটা তার অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি। তবে জিনিসটাও খাঁটি দেবে সফি। মেয়েটার কপালে দুঃখ আছে।

সফি বেরিয়ে যেতে নবেন্দু মল্লিক প্রধানকে ডেকে দশ মিনিট উপদেশ দিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে ফোন অফ করে দিলেন। আম পাবলিক এখন আর জ্বালাতে পারবে না। বাইরে তাঁর শাগরেদরা ঘোষণা করে দেবে যে, দাদা খুব বিজি।

নিজের ঘরে ঢুকে নবেন্দু মল্লিক ফোন করলেন শুক্লা দাসকে। ফোন পেয়ে শুক্লা দাস যেন গলে গেল। ছেলেমানুষের গলায় বলল, 'কই দাদা! আসবেন বলে আসলেন না তো? সেন্টার তো বেশির ভাগ দিন ফাঁকাই থাকে। আমার মধ্যে বুঝি গরম কিসু নাই?'

'কাল যাব ভাবছি।'

'চলে আসেন। আপনার বাড়ি। কাল বারোটার দিকে আসেন। একবারে গরম হইয়া বিকেলে যাবেন।'

'তুমি এসব এমনি এমনি দেবে শুক্লা?'

'কী যে কন দাদা! কত বড় মানুষ আপনে। কত চাপ। চাপ থাকলে পুরুষমানুষের কী লাগে, সেটা তো বুঝি। আমাদের বিপদ-আপদ হইলে আপনিই তো দেখবেন। শরীরের আগুন একটু আমায় দিয়া আরাম পাইবেন, তাই ডাকি। আপনি কিসু গিফ্‌ট দিলে নিব। কিন্তু সেইটাই বড় কথা হইল না।'

'কাল যাব। গন্ধওয়ালা কন্ডোম নিয়ে। বিদেশি। ছ'টায় ছ'রকম গন্ধ।'

'কাল কয়টা ইউজ করবেন? তিনটা?'

বলে খিলখিল করে হেসে উঠল শুক্লা দাস।
নবেন্দু মল্লিকের মন আলোয় ভরে গেল সেই হাসি শুনে। কাল ফিতে কাটার পর নেক্সট টাইম কোথাও যেতে হবে। ডুয়ার্সের রিসর্টে গেলে বাঞ্চোত সাংবাদিকগুলো ঠিক টের পেয়ে যাবে। বেস্ট হল নেপাল।
সফি যে জিনিসটা ভাল দিয়েছে তা কাশিয়াগুড়িতে নিজের বাড়ির সামনে আসতেই টের পেতে শুরু করেছিল নবেন্দু মল্লিক। নিদান মেনে সে দুধ খেয়ে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। বাইকে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল এক শাগরেদ। সে অবশ্য জানত যে কন্যাসাথির আপিস থেকে তাদের গাড়িতে একটা জরুরি ইন্সপেকশনে যাবেন তাদের দাদা। তাই নবেন্দুকে নামিয়েই ফিরে গিয়েছিল। হলুদ শাড়ি আর ব্লাউজ পরা শুক্লা দাস তাঁকে যখন সাদরে আগের দিনের ঘরটায় নিয়ে গেল, তখন নবেন্দু মল্লিকের মনে হচ্ছিল কয়েক ডজন ষাঁড় তাঁর দু'পায়ের ফাঁকে দাপাদাপি করছে। কান দিয়ে গরম ভাপ বার হচ্ছিল। গোটা শরীরে অসহনীয় এক প্রতিক্রিয়া অনুভব করছিলেন নবেন্দু মল্লিক। তিনি 'রতিকুশলা' শব্দের অর্থ জানতেন না। জানলে পরের এক ঘণ্টায় শুক্লা দাসের ভূমিকাটি তিনি উক্ত শব্দেই প্রকাশ করতেন। সেই একটা ঘণ্টা সপ্তম স্বর্গে ঘুরে বেড়ালেন নবেন্দু মল্লিক। দেখা গেল যে, পুরুষকে তৃপ্তিদানের ক্ষেত্রে শুক্লা দাস একজন অতি দক্ষ রমণী।
কন্যাসাথির গাড়ি যখন ফিরে এল, তখন নবেন্দু মল্লিক ক্লান্ত ও পরিতৃপ্ত শরীরে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন। ছলনার শীর্ষে উঠে হলুদ আঁচলে গা ঢেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল শুক্লা দাস। রমণের কোনও চিহ্নই তার চেহারা আর ভাবে দেখা যাচ্ছিল না তিলমাত্রও।

৪৮

সে দিন রঞ্জিতের দাক্ষিণ্যে বুলেটের হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়ার পর নবীন রাই চার দিন ধরে বাড়ি থেকে বার হচ্ছেন না। রঞ্জিত সে দিন ফোন করে পরে বলেছিল, 'কুছ দিন ঘরে থাকুন।'
এর পর গত পরশু কুরিয়ারে একটা খাম এসেছে নবীন রাইয়ের ঠিকানায়। ভিতরে একটা চিরকুট ছিল। তাতে কয়েকটা লাইন ও চিরকুটটাকে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ। লাইনগুলোতে বলা ছিল একটা ফেসবুক আইডি অনুসরণ করতে। তার নাম সুনীতা রাউত। সে আইডি থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নবীন রাইকে। যে দিন নবীনন দেখবে সুনীতা রাউত একটা বিশেষ বাক্য পোস্ট করেছে, তার পরের দিন তিনি যেন মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সির সামনে দেখা করেন। সেই বিশেষ বাক্যটা হবে 'কাম আউট নিউ'। ইমার্জেন্সির কাছে অপেক্ষা করার সময় বিকেল তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে।
নবীন রাইয়ের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থাকলেও খুলতেন ন'মাসে-ছ'মাসে। গত পরশু থেকে তিনি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই অনলাইন। সুনীতা রাউতের প্রোফাইলে বেশ সুন্দরী একটা মেয়ের ছবি। মেয়েটা রিয়্যাল। কারণ তার নানান পোশাকে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর ফোটো দেখা গিয়েছে। এ ছাড়াও দেশবরেণ্য নেতাদের ছবিও পোস্ট করে সে। মেয়েটা দলেরই কোনও বিভাগের কেউ হবে। রঞ্জিতের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।
চার দিনের দিন রাত ন'টায় প্রার্থিত পোস্টটি ফুটে উঠল সুনীতা রাউতের দেয়ালে। সঙ্গে টি-শার্ট পরা একটা ছবি। দুটো বোতাম খোলা থাকায় বুকের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। নবীন রাই দেখলেন, এক মিনিটের মধ্যে একুশটা লাইক আর ছ'টা কমেন্ট পড়ে গেল তাতে। একজন আবার জানতে চেয়েছে, 'হু ইজ নিউ বেরি?' এর পর রাতে খুব একটা ঘুমাতে পারলেন না নবীন রাই। গুলি চালানো নিয়ে কাগজে-টিভিতে বিস্তর লেখালিখি হয়েছে। জানা গিয়েছে যে, অতি শক্তিশালী রাইফেল থেকে ছোড়া হয়েছিল গুলিটি। সেই দরের রাইফেল আর্মির হাতেও নাকি নেই। সুতরাং জঙ্গিদলের কাজ বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে। কিন্তু গুলি চালানোর ধরন দেখে বিশেষজ্ঞদের মনে হয়েছে, বিশেষ কাউকে মারতে চেয়েছিল তারা। তাই জঙ্গি নাকি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। অবশ্য এইসব আলোচনায় নবীন রাইয়ের কোনও আগ্রহ নেই। এখন তাঁর প্রধান চিন্তা নিরাপত্তা নিয়ে। অন্য দিকে, একটা কাজ নিয়েই ভেবে যাচ্ছেন তিনি। তা হল প্রতিপক্ষকে পালটা মার দেওয়া। শিলিগুড়ির বুকে তাঁকে গুলি করে মারার চেষ্টা হয়েছে মানে বিপক্ষ জবরদস্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে। অস্তিত্বের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে বলতে গেলে।
পরদিন দুপুর থেকে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। নবীন রাই নিজের গাড়িতেই বার হলেন। পাশে সদ্য নিয়োগ করা দেহরক্ষী। গোর্খা রেজিমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। পিস্তল তো আছেই। দরকারে সেকেন্ডের মধ্যে কোমর থেকে কুকরি বার করে তিরিশ ফুট দূরে থাকা যে কোনও ব্যক্তির বুকে নির্ভুল লক্ষ্যে ছুড়ে মারতে পারে।
মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সির সামনে তিনটের একটু আগে এসে কিছুক্ষণ গুঁড়ো বৃষ্টিতে ভিজলেন নবীন রাই। তারপর খেয়াল করলেন, ঠিক সামনে দিয়ে অন্যমনস্কের মতো হেঁটে চলে যাচ্ছেন রঞ্জিত। নবীন রাইকে তিনি যেন দেখলেনই না। বিষয়টা অনুমান করে খানিকটা দূরত্ব রেখে তাঁর পিছু নিলেন নবীন রাই। খানিকটা হাঁটার পর রঞ্জিত যেন বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য একটা বড় গাছের নিচে দাঁড়ালেন। নবীন রাইও করলেন ঠিক সেই কাজটাই।
'আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান। ব্যানার্জি সাহেবের অর্ডার।' এক ঝলক নবীন রাইকে দেখে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চাপা স্বরে বললেন রঞ্জিত, 'পহেলা রাউন্ডে আমাদের তিনজন ডেড হল। আপনি ভি হোতেন। আখুন রিস্ক নিবেন না। নেপাল চলে যান। আর আমাকে একটা আচ্ছা আদমি দিন।'
'কেমন আদমি?'
'জগন্নাথ বলে একটা ছেলেকে ডার্ক ক্যালকাটা তুলে নিয়েছে। ওটাকে আগে খতম কোরে দিব। যেসব খেল চোলছে সিখানে, ওই জগন্নাথ হল কালা পানের টেক্কা। ওটাকে খতম কোরে আমি ফেসবুকে পোস্ট কোরিয়ে দিব। আপনি লোক কবে দিবেন?'
'কালকেই দিয়ে দেব।'
'বোলবেন চোখে ইয়েলো সানগ্লাস পরে তেনজিং নোরগে বাস স্ট্যান্ডের টিকিট কাউন্টারের সামন থাকতে। আমি পিক করিয়ে নিবো। কোড বোলে দিবেন টয় ট্রেন। ঠিক আছে?'
'একদম।'
'দেন গো ব্যাক নাউ। নেপাল কবে যাচ্ছেন? টুমরো?'
'বাগডোগরা কাঠমান্ডু ফ্লাইট কালকে আছে।'
বলে আর দাঁড়ালেন না নবীন রাই। দ্রুত পা চালালেন নিজের গাড়ির দিকে। কিন্তু চালকের আসনে বসে স্টার্ট দিয়ে গিয়ার ফেলতে গিয়ে থমকে গেলেন মুহূর্তের জন্য। খানিক দূরেই দুটো মেয়ে কথা বলছিল। তাদের একজনকে বিলক্ষণ চেনেন নবীন রাই।
মুনমুন টোপ্পো। ডুয়ার্সের মেয়ে, সাপ্লাইয়ের কাজে নেমেছে কিছুদিন হল। এ লাইনে ডুয়ার্সে কেউ নামলেই তার বায়োডাটা চলে আসে নবীন রাইয়ের কাছে। সঙ্গে ফোটো। এর ক্ষেত্রে ইনফো পাঠিয়েছিল বিজু প্রসাদ। এ মেয়ের ফোটোটা বেশ মন দিয়ে দেখেছিলেন নবীন রাই। কারণ মেয়েটা এক ব্যবসায়ীর রক্ষিতা এবং অসম্ভব সেক্সি লুক। সাপ্লাই না করে নিজে ক্যামেরার সামনে এলে অনেক বেশি কামাবে।
কিন্তু এখানে কী করছে মুনমুন টোপ্পো? কার হয়ে কাজ করছে সে? বিজু প্রসাদ তো মরে গিয়েছে!

(ক্রমশ)

শখের বাগান

সহজ গ্রিন হাউজে বছরভর পালং চাষ

পালং শাক সকলের প্রিয় শীতকালীন একটি সবজি। কিন্তু এখন পালং শাকের চাষ সারা বছরই সম্ভব। এ সময়ে পালং শাক বাজারে ৭০-৮০ টাকায় বিকায়। অল্প জায়গাতে খুব সহজেই আপনিও পালং শাক লাগাতে পারেন। বাঁশের কাঠামো তৈরি করে পলিথিন শিট দিয়ে ঢাকুন অতিরিক্ত বৃষ্টি বা রোদ। একটা প্লাস্টিক সযত্নে রাখলে পাঁচ-ছ'বছর টেকে। কাঠামো সারা বছর থাকবে, কিন্তু প্লাস্টিক আষাঢ় মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত টাঙিয়ে রাখবেন। মাসে একবার অর্থাৎ পাঁচবার পালং বীজ বুনে আপনি পাঁচ মাস পর্যন্ত 'সহজ গ্রিন হাউজ' থেকে ফসল তুলতে পারবেন। জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের দরকার নেই, জৈব সার প্রয়োগ করলেই হবে। তবে ধসা ও পোকা আটকানোর জন্য আপনাকে সপ্তাহে একবার স্প্রে করতে হবে। হলদিবাড়ি স্পেশাল বীজ বিভিন্ন ব্র্যান্ডনেমে পাওয়া যায়। ময়নাগুড়ির চাষিরা এ ব্যাপারে এগিয়ে। যোগাযোগ করুন দক্ষিণ উল্লার ডাবরি গ্রামের রোহিণী বর্মণ এবং উত্তরডাঙাপাড়ার কমল বিশ্বাসের সঙ্গে।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস

শুধু সৃজনশীলতা নয়, তাকে বাণিজ্যে সফলও করতে চান যে গৃহবধূ

ছোট ছোট দু'টি সন্তান, সেই সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-পরিজন, স্বামী-সংসারের দায়িত্ব-কর্তব্য, তার উপর শিক্ষিকা হিসেবে নিজের কর্মব্যস্ত জীবন— এতসব সামলানোর পর আর তো অবসর সময় হিসেবে কিছু বাঁচবার কথা নয়। কিন্তু মনের খিদে অন্য ব্যাপার। ছোট্টবেলা থেকেই সেই ভালবাসাকে লালন করে গিয়েছেন যত্নে। নানানরকম বাতিল জিনিস দিয়ে বানিয়েছেন ঘর সাজানোর সামগ্রী। বানিয়েছেন সাজগোজের সরঞ্জাম। লাটাগুড়িতে থেকে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে রিনি পাল চৌধুরী বিয়ে হয়ে চলে আসেন মালবাজারে বসু পরিবারে। ততদিনে পরিণত মানসিকতা এবং কাজের ধরনের সঙ্গে পালটে গিয়েছে বিষয়বস্তুও। অসাধারণ সব শাড়ি, মেয়েদের জন্য কুর্তি— এসব বানানো তো চলেছেই, সেই সঙ্গে বিছানার চাদর, পর্দা ইত্যাদি।

ছবিটা রিনি বরাবরই বেশ ভাল আঁকতেন। একটা সময় মনে হল, ছবির ব্যাকরণটাও জানা দরকার। মনের মতো ছবিটা তাহলে আরও এক ধাপ উন্নত হবে। আঁকা শিখতে শিখতেই সেই শিক্ষকের কাছ থেকে মাটির গয়না বানানোর কারিগরি তালিম নিলেন তিনি। রিনি পাল চৌধুরী বসু শুরু করলেন নতুনরকম সৃজনশীল ভাবনা দিয়ে নতুন ধরনের মাটির গয়না তৈরির কাজ। এসব নিয়ে বাণিজ্যিক প্রকল্পের পরিকল্পনাও যে নেই তেমন নয়, সেদিকটাও ভাবছেন পাশাপাশি। একটা ছোটখাটো ঘরে বসে যখন কথা বলছিলাম, ওঁর নিজের তৈরি জিনিস দেখছিলাম আর জেনে নিচ্ছিলাম এসব বিষয়ে ওঁর নানান অভিজ্ঞতার কথা, তখন মনের ভিতর একটাই প্রশ্ন বারবার উঁকি দিচ্ছিল যে, বহু মেয়েই বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে সমস্ত দিক সামলানোর পর আর নিজের জন্য ভাববার সময় করে উঠতে পারেন না, ফলে অনেক প্রতিভাই নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে রিনি পারলেন কী করে? ওঁর কাছ থেকেই উত্তরটা জেনে নেওয়া যাক— 'ভিতরে যদি তীব্র ইচ্ছে লালন করা থাকে তাহলে কোনও বাধাই পথ আটকাতে পারে না। হয়ত বা সাময়িক খানিকটা ঝড়ঝাপটা আসতেও পারে, কিন্তু মনের দৃঢ়তায় সব কাটিয়ে ওঠা যায়।' রিনির ইচ্ছে আছে অদূর ভবিষ্যতে তাঁর এই শৈল্পিক কাজকর্মকে বাণিজ্যিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার। তার প্রক্রিয়া অবশ্য ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন তিনি। আমরা, 'এখন ডুয়ার্স', তাঁর আগামী দিনের সাফল্য কামনা করি।

শ্বেতা সরখেল

রসিক বিল নিয়ে রসিকতা কতদিন চলবে ?

সবুজ বনানী ও প্রকৃতির বুক চিরে সুদীর্ঘ এক বিল বা জলাশয়। শীতকালে জানা-অজানা দেশি-বিদেশি হাজারো পাখির কলতানে মুখর হয়ে ওঠে বিল। ওরা পরিযায়ী পাখি। অধিকাংশই সুদূর সাইবেরিয়া থেকে আসে। শীত শেষে আবার নিজ দেশে পাড়ি জমায়। বিলের মিষ্টি জলে হরেক রকমের মাছের অবাধ বিচরণ। এই বিলটি একসময়ে নজরে আসে প্রকৃতিপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের। প্রথমে স্থানীয় উদ্যোগ ও পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বিলটি সংরক্ষণ করা হল মাছ ও পাখি সংরক্ষণকেন্দ্র হিসেবে। ১৯৯৬-৯৭ সালে বিলটি অধিগ্রহণ করে রাজ্য বন দপ্তর।

এভাবেই মূলত পক্ষী সংরক্ষণকেন্দ্র হিসেবেই রসিকবিলে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্র বা ইকো টুরিজম গড়ে উঠল। কোচবিহার শহর থেকে ৪৫ কিমি এবং আলিপুরদুয়ার থেকে ৩৪ কিমি দূরত্বে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বোচামারি গ্রামে ১৭৫ বর্গমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত হয় রসিকবিল। হইহই করে যাত্রাপথ রচনা করে রসিকবিল। বিলের মিঠা জলে কুটিপট্টি, বোরোলি মাছ এবং সঙ্গে হাজারো দেশি-বিদেশি পাখি। যেমন সভেলার, পিন্টাল, ছোট করমোনেন্ট, বড় করমোনেন্ট, উইনগন ডাক, গেডওয়াল, রেড ক্রেস্টেড, হুইস্‌লিং টেল, মোডলারের পাশাপাশি মাছরাঙা, হর্নবিল।

ধীরে ধীরে সেজে উঠল রসিকবিল। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে কাজ এগিয়ে চলে। পরিষ্কার করা হয় বিল। গড়ে ওঠে বন দপ্তরের বিট অফিস, হয় সীমানা নির্ধারণ, তৈরি হয় ঘেরাটোপ, পার্কিং জোন, পর্যটকদের চাহিদা মেটাতে সুউচ্চ নজরমিনার, জেলা পরিষদের রেস্ট হাউস। বিলের উপর তৈরি হয় এক সুদীর্ঘ নজরকাড়া ঝুলন্ত সেতু। বিলে চালু হয় পর্যটকদের জন্য বোটিং। রসিকবিল হয়ে ওঠে আসাম-বাংলা সীমান্তের সর্ববৃহৎ ও আকর্ষণীয় ইকো টুরিজম স্পট। ২০০০ সালে দুটো হরিণ দিয়ে শুরু হয় এই রসিকবিল ইকো টুরিজম।

সাল ২০০৬। ওই বছর 'ন্যাশনাল অথরিটি অব জু' রসিকবিলের এনক্লোজারের মধ্যেই গড়ে তোলে 'মিনি জু'। এবার রসিকবিল হয়ে উঠল রসিকবিল প্রকৃতি

ফাঁসজাল ফেলে ও ব্যাটারিচালিত ছিপ দিয়ে বিলের মাছ অবিরত তুলে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। কিন্তু নেই কোনও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, প্রায় নীরব দর্শক বন দপ্তর। এডিএফও বলেন, 'ওখানে বন দপ্তরের স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা মাত্র তিনজন। দীর্ঘদিন কোনও কর্মী নিয়োগ হয়নি।' ভালভাবে খোঁজ নিতেই জানা গেল যে, বন বা জঙ্গল— এত বড় বিল, ইকো টুরিজম এবং মিনি জু-র জন্য বন দপ্তরের স্থায়ী কর্মী রয়েছেন মাত্র তিনজন

পর্যবেক্ষণকেন্দ্র ও মিনি জু। হরিণের পুনর্বাসনের জন্য রসিকবিলের এলাকায় বনাঞ্চলেই গড়ে ওঠে 'ডিয়ার পার্ক'। একসময় এই ডিয়ার পার্কে হরিণের সংখ্যা ছিল ৯৬, আজ কমে মাত্র ২২টি। গড়ে তোলা হয় ঘরিয়াল পুনর্বাসনকেন্দ্র। বহু প্রজাতির পাখি এনে খাঁচায় পোরা হল। তাতে স্থান পেল সি-প্যাট-ব্যাট, গোল্ডেন ফিজেন, সিমন্ট, টিয়া, বনমোরগ, পায়রা, কাকাতুয়া, হর্নবিল। বিভিন্ন প্রজাতির সাপও স্থান পেল রসিকবিলের মিনি জু-তে।

প্রকৃতপক্ষে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই রসিকবিল বাংলার টুরিজম মানচিত্রে জনপ্রিয়তা পায়। পর্যটক উপচে পড়ে রসিকবিলে। পর্যটকদের চাহিদা মেটাতে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম গড়ে তোলে রিসর্ট। চাঁদনি রাতে রসিকবিল ও রিসর্টের চাহিদা চরমে ওঠে। গড়ে তোলা হল এক সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য রঙিন মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম। আর শীতকালে বিলেরই একটি নির্দিষ্ট অংশে চালু হল বনভোজন। নিযুক্ত হলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। নিরালা একটি অখ্যাত প্রায় এলাকা ধীরে ধীরে বিখ্যাত হয়ে উঠল। বিলের প্রবেশপথে গড়ে উঠল ছোট্ট এক বন্দর।

যত তাড়াতাড়ি গোড়াপত্তন, ঠিক তেমনই অবক্ষয়ও ঘটে প্রায় একই গতিতে। এই বর্ষায় ঠিক কী অবস্থা ইকো টুরিজম ও মিনি জু রসিকবিলের? এক কথায়, ভয়াবহ। রসিকবিলে এখন প্রায় আসেই না পরিযায়ী পাখি। এর পিছনে মূল কারণ হল, সম্পূর্ণ বিলটি কচুরিপানায় আবৃত। দীর্ঘদিন পরিষ্কার করা হয়নি। এ বিষয়ে কোচবিহার বন দপ্তরের এডিএফও দেবরাজ শূর জানান, 'কচুরিপানা শীতকালে ওঠানো হয় এবং ২০১৫ সালে জেলা শাসকের তরফে এনআরইজিএস প্রকল্পে কোনও ফান্ড না আসায় তা করা সম্ভব হয়নি।' অন্য দিকে ফাঁসজাল ফেলে ও ব্যাটারিচালিত ছিপ দিয়ে বিলের মাছ অবিরত তুলে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। কিন্তু নেই কোনও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, প্রায় নীরব দর্শক বন দপ্তর। এডিএফও বলেন, 'ওখানে বন দপ্তরের স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা মাত্র তিনজন। দীর্ঘদিন কোনও কর্মী নিয়োগ হয়নি।' ভালভাবে খোঁজ নিতেই জানা গেল যে, বন বা জঙ্গল— এত বড় বিল, ইকো টুরিজম এবং মিনি জু-র জন্য বন দপ্তরের স্থায়ী কর্মী রয়েছেন মাত্র তিনজন এবং ওয়েবেল-এর মাধ্যমে ঠিকা কর্মী রয়েছেন ন'জন। এঁদের মধ্যে গেট পাহারায় পাঁচজন, জু-কিপার দু'জন আর বাঘসহ অন্য পশুদের খেতে দেবার জন্য মাত্র দু'জন কর্মী। নেই কোনও স্থায়ী রেঞ্জ অফিসার, নেই বিট অফিসার। কোচবিহার ডিভিশনের রেঞ্জ অফিসার-১ পদাধিকারবলে 'জু-কিপার'। অর্থাৎ তিনিও পরিযায়ী। নেই অন্য কোনও পদাধিকারী।

বিরাট গোলবাড়িতে রসিকবিলের রঙিন মাছের সুদৃশ্য অ্যাকোয়ারিয়াম সকলের খুব প্রিয় ছিল। তাক লাগানো গোল্ড ফিশগুলোর সদম্ভ বিচরণ কচিকাঁচাদের অপার আনন্দ দিয়েছে বহু বছর। বর্তমানে অ্যাকোয়ারিয়ামের অস্তিত্ব নেই। জানা গেল, সেটি এখন গুদামঘর। বর্তমানে রসিকবিলের লেপার্ড পুনর্বাসনকেন্দ্রে লেপার্ড রয়েছে ৪টি। কিন্তু জং ধরা খাঁচা এবং বর্ষায় আগাছা ভরে থাকায় তাদের বিচরণভূমি খুবই অস্বাস্থ্যকর। ডিয়ার পার্কে এখন স্পটেড ডিয়ার রয়েছে মাত্র ২২টি। আগাছায় ভরা এবং বিভিন্ন স্থানে বর্ষায় জল দাঁড়িয়ে থাকায় করুণ অবস্থা মৃগকুলের। সাপের খাঁচাগুলো প্রায় ফাঁকা। পাখির খাঁচার দিক থেকেও শোনা যায় না এখন আর কিচিরমিচির। রসিকবিলের অন্যতম আকর্ষণ ঝুলন্ত সেতুটি জীর্ণ দশায়, যে কোনও মুহূর্তেই ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। একটি মিনি জু, এতগুলো পশুপাখি, অথচ নেই কোনও পশু চিকিৎসক। প্রয়োজন হলে তুফানগঞ্জ পশু হাসপাতালের চিকিৎসককে ডাকা হয়।

রসিকবিলের রসিকতার যেন শেষ নেই। এত 'নেই রাজ্য'র মধ্যেও কিন্তু অনেক কিছু আছে, যেগুলো একেবারেই থাকার কথা নয়। রয়েছে বাইকবাহিনীর দাপাদাপি, ফাঁসজালে মাছ ধরা, প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার, তারস্বরে মাইক বাজিয়ে বনভোজন, কাঠ চুরি— আরও কত কী। সর্বোপরি, বেশ কিছুদিন যাবৎ স্থানীয় পর্যায়ে উঠেছে বন উন্নয়ন নিগমের রিসর্টে অসামাজিক কাজ ও মধুচক্র চলার অভিযোগ। এক-দু'টি দৈনিক পত্রিকায় এ খবর ছাপা হতেই মাঝে যথেষ্ট হইচই পড়ে। এডিএফও দেবরাজ শূর এবং বন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন যথারীতি এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। বন মন্ত্রীকে মোবাইল ফোনে ধরা হলে কিছুটা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে বলেন, 'এ বিষয়ে আমার কাছে কোনও খবর নেই। রিপোর্ট পেলে এ বিষয়ে মন্তব্য করব, তার আগে নয়— আপনি এটাই লিখুন।' প্রশ্ন করেছিলাম, দ্বিতীয়বার আপনি রাজ্যের বন মন্ত্রী হয়েছেন এবং রসিকবিল আপনার নিজস্ব জেলায়। মুখ্যমন্ত্রী এসব ব্যাপারে খুবই কড়া মনোভাব দেখাচ্ছেন, আপনি কিছু বলুন। মন্ত্রী উত্তর না দিয়েই ফোন কেটে দেন। বন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান উদয়ন গুহ নিগমের দায়িত্ব নিয়ে দিনহাটায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'রসিকবিল নিয়ে আমার বেশ কিছু ভাবনাচিন্তা রয়েছে। নতুন দায়িত্ব নিয়েছি, ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয় দেখব।' প্রাক্তন সিপিআইএম বিধায়ক তমসের আলি রসিকবিল বিষয়ে ক্ষোভ

প্রকাশ করলেও বেশ সাবধানী মন্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'যে উদ্দেশ্য নিয়ে এলাকার মানুষের সহযোগিতায় আমরা রসিকবিল প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলাম, তার চরিত্র আজ হারিয়েছে। ন্যূনতম সংস্কার ও পরিদর্শন নেই, নেই পরিকাঠামো। মধুচক্র নিয়ে বহুদিন ধরে অভিযোগ আছে। হয়ত অভিযোগ বাস্তব। তবে আমি শুনেছি, কিন্তু নিজ চোখে এরকম কিছু দেখিনি। প্রশাসনের উচিত স্থানীয়দের অভিযোগ যাচাই করে জরুরি পদক্ষেপ করা, কেননা তারা শুধু শুধু অভিযোগ কেন আনতে যাবে?'

রসিকবিল এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা তথা কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া রসিকবিল সম্বন্ধে বেশ স্পর্শকাতর। তাঁর মূল বক্তব্য, রসিকবিলের মাধ্যমে তাঁদের বোচামারি-নাগুরহাট গ্রামের নাম বাংলা ছাড়িয়ে সারা দেশে পৌঁছেছে। এটার রক্ষণাবেক্ষণ দরকার এবং জু কর্তৃপক্ষর উচিত জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে বিলের সংস্কারসাধন। তাহলেই পরিযায়ী পাখিরা আবার আসবে, শ্রী ফিরবে রসিকবিলের। যা-ই হোক, বর্ষায় রসিকবিল বেহাল দশায় পতিত। শিলিগুড়ির নতুন ইকো পার্কে ধীরে ধীরে প্রচুর হরিণ এখান থেকে সরিয়ে নেওয়ায় স্থানীয় জনমানসে বিপুল ক্ষোভ জমে উঠেছে সম্প্রতি।

প্রতিনিয়ত রসিকবিল প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত জঙ্গল বা বনের ঘনত্ব কমে যাচ্ছে বেপরোয়া গাছ কাটা বা কাঠ চুরির ফলে। কাঠ চোরদের রমরমায় ভীতসন্ত্রস্ত বনকর্মীরাই— জানান স্থানীয়রা। বনসৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে বনকে পুরোপুরি রক্ষা করতে তাঁরা যে পারছেন না তা স্বীকার করে নিয়েছেন বনাধিকারিক দেবরাজবাবুও। তাঁর বক্তব্য, 'গুটিকয়েক কর্মী ও ফরেস্ট গার্ড দিয়ে একই সঙ্গে বিল, জু ও বনরক্ষা সম্ভব নয়। পর্যটক ও বনভোজনকারীদের ব্যবহৃত প্লাস্টিক ইতস্তত ফেলে যাওয়ায় ইকো টুরিজমের ভারসাম্য কতটা থাকছে তা সবারই বোধগম্য। ২০০০ সালে মাত্র দুটো হরিণ দিয়ে যে ইকো টুরিজমের যাত্রা শুরু, তার ভবিষ্যৎ আজ প্রশ্নের মুখে বইকি।

রসিকবিলের পরিযায়ী পাখি—

সভেলার, পিন্টাল, ছোট করমোনেন্ট, বড় করমোনেন্ট, উইনগন ডাক, গেড ওয়াল, রেড ক্রেস্টেড, হুইস্লিং টেল।

রসিকবিলের মিনি জু-র প্রাণীকুল—

লেপার্ড ৪টি, পাইথন ৪টি, ঘড়িয়াল ৩টি, স্পটেড ডিয়ার ২২টি, ময়ূর ৪টি, সি-প্যাট-ব্যাট ২টি, গোল্ডেন ফিজেন ৫টি, বনমোরগ ২টি, সিমন্ট ২টি।

দিব্যেন্দু ভৌমিক

ডাক্তারের ডায়েরি

শিশুদের ডেঙ্গু হলে বিপদ

প্রতি বছর বর্ষায় যে মারণ রোগের ছোবল খায় দক্ষিণ থেকে উত্তরবঙ্গ, সে হল ডেঙ্গু। আদ্যিকালের ভারতীয় নাম ডেঙ্গু। এখন ব্রিটিশ আর আমেরিকান উচ্চারণে প্রচলিত বাজারি পত্রিকায় নাম নিয়েছে ডেঙ্গি। ডেঙ্গুর আক্রমণ যে কোনও বয়সি মানুষের উপর হতে পারে, পুরুষ-মহিলা ভেদ নেই। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে সংক্রমণের মাত্রা বেশি আর রোগের তীব্রতাও মারাত্মক।

কেন ডেঙ্গু এত মারাত্মক? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমান পৃথিবীর ১১০টি দেশে এই রোগ এনডেমিক, অর্থাৎ বছর বছর হয়, ছাড়ে না। তার মধ্যে ভারত প্রথম সারিতে আর বর্ষায় ধানচাষের জলাজমি নিয়ে এ বাংলা তার মধ্যে এগিয়ে। সাধারণ জ্বর থেকে শুরু করে ভয়ংকর এই রোগে শেষ হয়ে যেতে পারে জীবন, তাই এ রোগ এত মারাত্মক।

ইতিহাসে খুঁজলে পাওয়া যাবে, অন্য অনেক কিছুর মতো এর প্রথম উল্লেখও চিন দেশে। ডেঙ্গু শব্দের উৎপত্তি অবশ্য আফ্রিকার সহেলি ভাষা থেকে, যার অর্থ শয়তানের সৃষ্ট রোগ। বিংশ শতকে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জন বার্টন আবিষ্কার করলেন, এ রোগটি ভাইরাস সৃষ্ট আর মশকবাহিত। দুষ্ট মশাটি হল ইডিস ইজিপ্টি, আরেকটা নাম টাইগার মসকিউটো।

কী করে ছড়ায় এই মারণ রোগ? ছড়ায় মশা থেকে মানুষে আর রোগী থেকে মশায়। রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসটির নাম ফ্ল্যাভি ভাইরাস। এক, দুই, তিন, চার— এরকম চারটি সেরোটাইপ। ডেঙ্গুর মশার একটা বৈশিষ্ট্য হল, সাধারণত দিনের বেলায় কামড়ায় না। ভোরবেলা বা সন্ধেবেলা কামড়ায়। মশা ডিম পাড়ে পরিষ্কার জমা জলে।

এবার প্রশ্ন হল, এ রোগের উপসর্গ কী? অথবা কী কী লক্ষণ দেখে বোঝা যাবে ডেঙ্গু হয়েছে? ডাক্তারি পরিভাষায় প্রথমেই আমরা বলি, 'হাই ক্লিনিক্যাল সাসপিশিয়ন'। অর্থাৎ ডেঙ্গুপ্রবণ এলাকায় বর্ষাকালে জ্বর হলেই এই রোগের কথাটা মাথায় রাখতে হবে। হঠাৎ করে জ্বর, তাপমাত্রা খুব বেড়ে যাওয়া, সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, পেশিতে ব্যথা ইত্যাদির কারণে এ রোগের আরেক নাম 'ব্রেক বোন ফিভার'। বিশেষ ধরনের র‍্যাশ বা গায়ে ছোপ ছোপ দাগ ডেঙ্গুর এক বিশেষ লক্ষণ।

মশার কামড়ের আট থেকে দশ দিন পর রোগের লক্ষণ শুরু হয়। জ্বরের সঙ্গে থাকে বমি ভাব, র‍্যাশ আর সারা শরীরে ব্যথা। সঙ্গে শুরু হয় তীব্র পেটব্যথা, হাতে-পায়ে, শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ। প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত, বমির সঙ্গে রক্ত। মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ হলে মৃত্যু অস্বাভাবিক নয়। ডেঙ্গুর সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা হল 'ডেঙ্গু শক সিনড্রোম'। হঠাৎ রক্তচাপ কমে গিয়ে কিডনি, হৃৎপিণ্ড

বিকল হয়ে মৃত্যু এগিয়ে আনে। রোগ নির্ণয় করার জন্য দ্রুত রক্ত পরীক্ষা প্রয়োজন। প্লেটলেট অর্থাৎ অণুচক্রিকার মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কমে যায়। এন এস-ওয়ান অ্যান্টিজেন টেস্ট দ্রুত ডেঙ্গু নির্ণয় করতে পারে এবং ভরসাযোগ্য। যদিও খরচের মাত্রা একটু বেশি।

রোগ তো ধরা পড়ল। চিকিৎসার কী হবে? ডেঙ্গুর ভাইরাস নির্মূলকারী নির্দিষ্ট কোনও ওষুধ নেই। জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল খেতে হবে নির্দিষ্ট মাত্রায়। অ্যাসপিরিন জাতীয় ব্যথার ওষুধ বন্ধ রাখতে হবে। ডিহাইড্রেশন রোধে প্রচুর জলপান প্রয়োজন। বিছানায় শুয়ে থেকে বিশ্রাম আর পুষ্টিকর আহার পথ্য। আর অবশ্যই ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়মিত চেক আপ।

এই মারণ রোগের প্রতিরোধ কীভাবে সম্ভব?

ভাইরাসবাহী রোগ প্রতিরোধকারী টিকা বা ভ্যাকসিন কার্যকর হতে পারে। তবে তা এখনও গবেষণাগারে বন্দি। আপাতত মশক নিধন, লার্ভা নিধন, বাড়ির চারদিকে জল জমতে না দেওয়া আর রাতে মশারির ব্যবহার— এসব ছাড়া উপায় নেই।

ডা. শান্তনু মাইতি

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-5 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মাথাভাঙা পৌরসভা

মাথাভাঙা মাছ বাজার পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে

সুটুঙ্গা ও মানসাই নদীর বাঁধ বরাবর পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে

মাথাভাঙা চৌপথীতে দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ চলছে

মাথাভাঙা ইমিগ্রেশন রোডে দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ চলছে

মাথাভাঙা পৌরসভার নতুন কিছু প্রকল্প

- **উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় মাথাভাঙা ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আধুনিকীকরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।**
- **মাথাভাঙা কলেজ মোড়ে অত্যাধুনিক বাস ও ট্রাক টার্মিনাস নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।**
- মাথাভাঙা মাছবাজারের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায়। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।
- হাইড্রেন প্রকল্পে ৮ নং ওয়ার্ডে শিবশংকর সা-এর বাড়ি (মনমোহন পাড়া) থেকে শুরু হয়ে কেষ্ট সাহার বাড়ি পর্যন্ত ২৬৫ মিটার লম্বা (চওড়া ৪ মিটার) হাইড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে পূর্ণ গতিতে। খরচ হবে ২২ লক্ষ টাকা।
- রাজ্য সরকারের নির্মল বাংলা প্রকল্প থেকে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য কমপ্যাক্টর গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ৯ নম্বর ওয়ার্ডে (কলেজ মোড়) একটি ম্যারেজ হল নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক আরও জানিয়েছেন—

শহরের নিকাশী ব্যবস্থা সংস্কারে রাজ্য সরকারের তরফে দেড় কোটি টাকার অনুদানে নতুন পাকা ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার চলছে।

আশুতোষ হলের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে ১৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। কাজ চলছে।

উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তালিকা—

- নদীর জল থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য ব্যয় হবে ৪০ কোটি টাকা। এর ফলে জলবাহিত রোগের সমস্যা দূর হবে। বাঁধ সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এতে বাঁধ বরাবর প্রায় ৩ কিমি পাকা রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুলের বাগান, বাতিস্তম্ভ হবে। ১ ও ৫ নং ওয়ার্ডে দুটি বন দপ্তরের পার্ক হবে।
- মালিবাগানে পুকুর সংস্কার করে বোটিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- কলেজ মোড়ে দুটি অথিতিশালা নির্মাণের কাজ চলছে।
- শহরে কনফারেন্স হল ও আর্ট গ্যালারি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

চন্দন কুমার দাস,
ভাইস চেয়ারম্যান

লক্ষপতি প্রামাণিক,
চেয়ারম্যান

মাথাভাঙা পৌরসভা

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.